প্রতিমা দেবী

সিগনেট প্রেস

কলকাতা ২০

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৫৯
প্রকাশক
দিলীপকুমার গুপ্ত
সিগনেট প্রেস
১০ । ২ এলগিন রোড
কলকাতা ২০
প্রচ্ছদপট
সত্যজিৎ রায়
সহায়তা করেছেন
পীযূষ মিত্র
মুদ্রক
প্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫ চিন্তামণি দাস লেন
প্রচ্ছদপট ও আর্টপ্লেট
গসেন এণ্ড কোম্পানি
৭ । ১ গ্রাণ্ট লেন
বাঁধিয়েছেন
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৬১ । ১ মির্জাপুর স্ট্রীট

স্বীকৃতি ॥ 'স্মৃতিচিত্র' প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী এবং শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন মহাশয়ের সাগ্রহ সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা স্মরণ করি। দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর সংগ্রহ থেকে নেওয়া। গুণেন্দ্রনাথের ছবিটি শ্রীযুক্ত শুভ মুখোপাধ্যায় ও অবনীন্দ্রনাথের শেষ ছবিটি শ্রীযুক্ত নীহার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যৌবনে

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌদামিনী দেবী
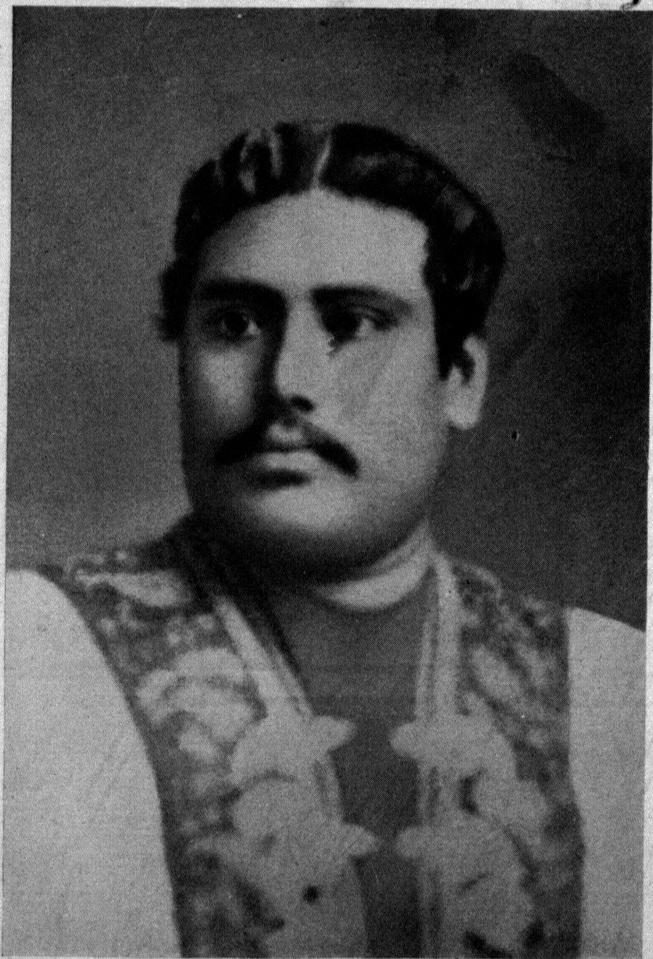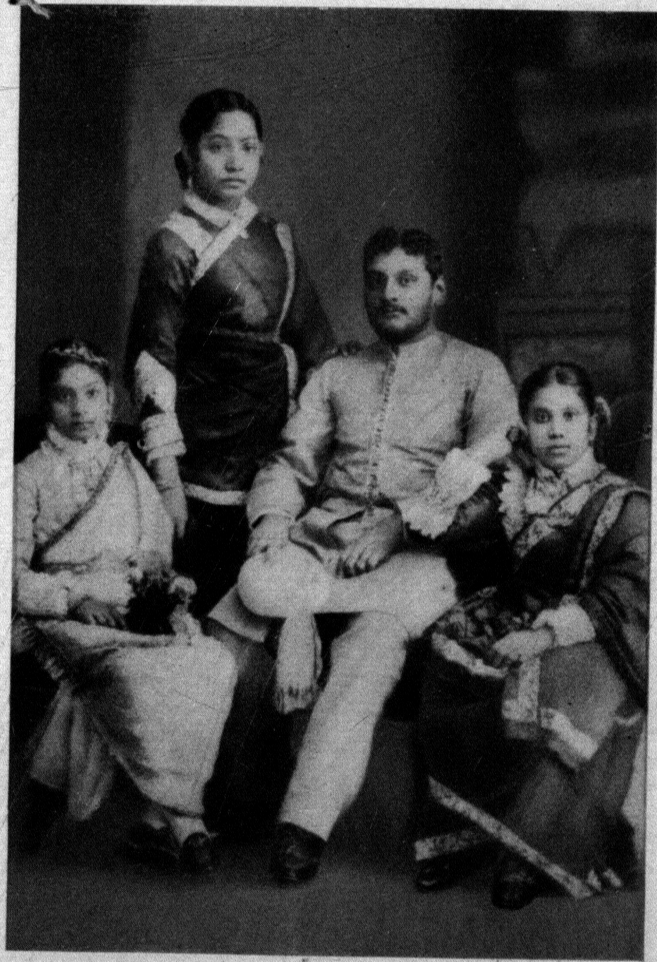
সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহধর্মিণী প্রমোদকুমারী, ভগিনীদ্বয় সুনয়নী ও বিনয়িনী

বিনয়িনী দেবী

রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও সহধর্মিণী সুনয়নী দেবী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যে যুগের কথা শুরু করলুম সেদিন বাঙলার নবযুগ, বর্তমান সাহিত্য-শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই দিন। যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে তখন বহুকালের সনাতন প্রথাগুলি নাড়া খেয়ে উঠেছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এখনকার মতো গভীরভাবে ঘটেনি, দেউল তখন ছিল খাড়া প্রাচীন বটের মতো, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরেছিল ঘুণ।

তখনকার প্রথা অনুসারে সামাজিক জীবনে পুজোপার্বণ, ব্রত-কথকতা, দোল-উৎসব ইত্যাদি অনেক কিছু প্রচলিত ছিল। আর সেই উৎসবগুলিই ছিল সামাজিক মেলামেশার পথ। ছোটবেলার ঝাপসা ছবি যা মনে পড়ে তাই দিয়ে শুরু করি এই গল্প। দিনের আলো ম্লান হয়ে এলেও গোধূলির রাঙা রঙ লাগে প্রকৃতির গায়ে। সেই ধূসর ঘোমটার অন্তরালে তার স্মৃতি ঘোলা হয়ে এসেছে, তবু সেদিনের ছবি আজও মনের উপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে। তাই সামনের বৃহৎ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা উতলা হয়—ঐ অন্ধকার নির্জন বাড়িটা একদিন প্রাণের আলোড়নে

পূর্ণ ছিল, আজও সেই পুরনো কালের দু-একজন স্মৃতির অবশিষ্ট খুঁটি আগলে বসে আছেন। চক-মেলানো ঠাকুর-দালানটির দিকে চেয়ে মনটা তখন ভরে উঠেছে, হঠাৎ অন্ধকার আকাশ চিরে পেঁচার ডাকে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। চিলছাদের এককোণে একটা আকাশপ্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে, আমার চোখের সামনে ঐ ভাঙা বাড়ির আত্মা তার কবর থেকে বেরিয়ে এল, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের তান শুনতে পাচ্ছি, আবার জ্বলল আলো, চোখের সামনে যেন পরীস্থানের ইমারত।

গেছি সেই রূপকথার যুগে চলে, যখন পাঁদারী পিসিমার লেপের তলায় এক ডজন ভাই বোন মিলে সেটিকে ভাগাভাগি করে নিয়ে যে যতটা পারে দখল করেছি পিসিমার কোলের কাছটা। তারপর চলল—গোলেবকাওলী, হাতেম তাই, কঙ্কাবতী—আমরা মর্তলোক থেকে চলে যেতুম কে জানে কোথায়, কেবল পিসিমার গলার স্বর থাকত আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে। সেই মানুষটি আমাদের নিয়ে ফেলতেন কখনো গহন বনের অন্ধকারে, কখনো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে, আর কখনো বা বাঙলাদেশের শ্যামল ক্ষেতে, পাড়াগাঁয়ের নদীর তীরে।

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি প্রকাণ্ড বাড়ির বনেদী ব্যাপার মস্ত রান্নাবাড়ির উঠনের সামনে লম্বা বারান্দা। সকাল থেকে একটা

কর্মের স্রোত বইত সেখানে। আসছে মেছুনী, নাপিত, সরকার, আসছে তরকারি, বাজার, আমলার হিসেব, দাসদাসীর অনুযোগ-অভিযোগের বিচার, বোষ্টমীর কীর্তন, ভিখারীর 'জয় রাধে, শ্রীরাধা'—জীবনের কত বিচিত্র ধারা চলত সকাল থেকে। সে যেন বৃহৎ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত রূপ, একটা একান্নবর্তী পরিবার ঘিরে তার নিত্য ব্যবস্থা। কর্ত্রী বসতেন তাঁর কাঠের তক্তায়, সেই তাঁর 'ময়ূরতক্ত'—তাঁর একপাশে বসতেন বঁটি নিয়ে পাঁদারী পিসিমা, আর একদিকে সার্বজনীন কনে দিদি। চলত তরকারি কোটা আর এবাড়ি ওবাড়ির খোশগল্প, বৌঝিদের সমালোচনা, কীর্তনীয়ার গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাজারের হিসেবও বাদ পড়ত না। তার পর একে একে আসন পাতা হত, প্রথমে ছেলেদের খাওয়া তারপর পুরুষদের, শেষে আসত মেয়েদের পালা। বাড়ির গিন্নী কখন লুকিয়ে সকলের শেষে ঠাকুরের প্রসাদ মুখে দিতেন কেউ তার খোঁজও রাখত না। তাঁর সঙ্গে বসত তিন-চারটে পোষা বেড়াল, তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে তিনি কি খেতে পারেন? তারাই শেষ অভুক্ত সংসারে।

সেই দালানেই বিকেলবেলা মাদুর পড়ত, মুখ সাফের এক-একটি বাক্স নিয়ে মাদুরের উপর বসতেন বৌদিরা বেণীরচনায়। সেই পেঁটরার মধ্যে প্রসাধনের বিচিত্র সরঞ্জাম সাজানো থাকত। এখনকার চেয়ে যে তার কোথাও কিছু কমতি ছিল, তা বলতে পারি

না। পমেটম রুজ থেকে আরম্ভ করে গোলা খয়ের আর কাঁচ-পোকার টিপ আলতা সিঁদুর সুর্মা কাজল কিছুই বাদ যেত না। মাথাঘষার মিষ্টি গন্ধ বাক্স খোলার সঙ্গেই ভুরভুরিয়ে উঠত।

চার থেকে পাঁচ গুছির বিনুনি আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জড়িয়ে গোড়া-বাঁধা ফিতেটিকে ঠোঁটের পাশে চেপে ধরে নানা প্রকারের থাপড়া-থুপড়ি দিয়ে খোঁপা বাঁধা শেষ হত। তারপর একে একে তাঁরা আসতেন শাশুড়ীর সিংহাসনের কাছে। তিনি এক-একটি বেল কিম্বা জুঁইয়ের মালা জড়িয়ে দিতেন খোঁপায়। বেনে, বাগান, মনভোলানো, ফাঁশজাল, কলকা, বিবিয়ানা—কত রকমের শৌখিন খোঁপাই না তখন ছিল। এই খোঁপা বাঁধায় নাপতিনীরাই ছিল পটু, তারাই বাড়ি বাড়ি খোঁপা বেঁধে আলতা পরিয়ে বেড়াত, নখ রাঙানো হত তখন মেদি পাতার রসে। ম্যানিকিয়োর-এর কিছুমাত্র ত্রুটি হত না।

গিন্নী সৌদামিনী ছিলেন বড়লোকের ঘরের বৌ। তবু অনেক কিছু জীবনে সইতে হয়েছিল তাঁকে। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে তিনটি শিশুপুত্র আর দুটি বাচ্চা মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হলেন। আমরা বাড়ির কর্তাকে দেখিনি, কেবল যখন বয়েস হয়েছিল দিদিমা নাতিনাতনীদের কাছে খোশগল্প বলতে বলতে তাঁর যৌবনকালের অনেক কথা বলে ফেলতেন, তারই সঙ্গে জড়িয়ে থাকত দাদামশাইয়ের ছবি, তাঁর বিবাহিত

জীবনের আভাস। মন যেন তার প্রকাশের সীমানায় এসে থমকে দাঁড়াত, অতীতের দিকে চেয়ে, চাপা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে উথলে উঠত তাঁর ভুলে-যাওয়া দিনের ব্যথা।

আট বছরের মেয়ে তিনি এসেছিলেন ফুলতলা গ্রাম ছেড়ে, সে কি আজকের কথা! বলতেন, যেদিন যশোর ছেড়ে এলুম এই শহরের অন্দরে—বাড়ির নতুন বৌ আমি, তখন পরিচিত নই কারও সঙ্গে, কেবল দু-চারজন ননদের সঙ্গে সখী-সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছি সে তাদেরই গুণে, তারাই বুঝতে পারত এই গ্রামের মেয়ের কান্না।

খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির সকলে বৈঠকখানাঘরে আশ্রয় নিয়েছে, গরমের দিনে ঝিমনো হল চূড়ান্ত আলসেমি। টানাপাখার হাওয়ায় গড়গড়া টানতে টানতে কর্তাদের চোখ পড়ত ঢুলে। নতুন বর তখন অন্দরে আহারের পর বিশ্রাম করতে আসতেন। বধূ পা টিপে জানালার কাছে দাঁড়াত আকাশের দিকে চেয়ে—ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে ঘুঘুর ডাক মিলত গিয়ে বধূর বুকের তালে তালে, হঠাৎ পশ্চিমে মেঘ জমে আসত, চিলেরা দূর আকাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দেখা যেত, তারই সঙ্গে বধূর মন উড়ে যেত যশোরের ফুলতলা গ্রামে, সে ভাবত এতক্ষণ সেখানে নারকোল গাছের সার পুকুরের জলে ছায়া ফেলেছে, এই কালো মেঘে আমাদের দীঘির জল এখন নীল দেখাচ্ছে বুঝি। যেখানে কলসী ভাসিয়ে মেয়েরা পুকুরের এপার

ওপার হয়, যেখানে ছোট্ট গাঁয়ের ছোট্ট সুখদুঃখের মধ্যে মানুষ তৃপ্ত, বধূ চিলের মতো চলে যেত কোন সেই সুদূর গাঁয়ে। মনে মনে বলত, পাখি তোমার মতো যদি থাকত আমার ডানা, তাহলে আমাকে কি বাঁধতে পারত কেউ এই বনেদী ইঁটের পাঁজার ভিতর।

তখনকার বড়ঘরের ব্যাপারের মধ্যে অনেক কিছু লুকোনো সুখ দুঃখ অতৃপ্তি থাকত, কোথাও একটু অবকাশ পেলেই গুমরে উঠত ফাঁকা মন। সেদিনের জীবন মেয়েদের পক্ষে যে খুব আরামের ছিল তা বলতে পারি না। একদিকে মনুর আইন আর একদিকে মুসলমানের পর্দা মেয়েদের অন্তঃপুরের আসবাব করে তুলেছিল, আর বাইরে পুরুষদের ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। দিদিমা বলতেন, তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের হাওয়া বদলানো দরকার হলে বোটে যাওয়ার রেওয়াজ ছিল। শরতের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসত বজরা জমিদারী থেকে—কর্তার হুকুমে এবারও তাই হল। ছেলেদের পড়াশুনার ক্ষতি হবে ভেবে তাদের পিসতুত ভাগ্নের গার্জেনসিপে রেখে দুই ছোট মেয়ে ও গিন্নীকে নিয়ে যাত্রা স্থির হল, সঙ্গে যাবেন কর্তার দুই বোন। তখনকার দিনে বোটে যাওয়াটাই পর্দা থেকে বেরবার একমাত্র সুযোগ মেয়েদের। কলকাতার আহিরিটোলার ঘাট থেকে বোটে চড়া হল,

বড় বোটে কর্তা-গিন্নী মেয়ে দুটিকে নিয়ে উঠলেন এবং আরো দুটি ছোট বোট ভাড়া নেওয়া হল বোনেদের জন্য। সঙ্গে জিনিসপত্র, তরিতরকারি, চাকরবাকর, আহারের সব রকম আয়োজন। পরিবারের সকলেই উঠলেন। বোট ছেড়ে দিল, দুটি বোন বোটের শার্সি তুলে চেয়ে রইল বাইরের দিকে, মনে হল যেন একখানা মস্ত বাড়ি ভেসে চলেছে, পিছনে মাঝি তার প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঢেউয়ের আঘাতে টলমল করে উঠছিল দেহ, নিজেদের সামলে নিয়ে বাইরের সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুটি বোন। সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে, জলের একদিকে পড়েছে তীরের কালো ছায়া আর অপর দিক থেকে গাছের ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। জ্যোৎস্নাতে গঙ্গার ঢেউ চিকচিক করে উঠছে। উপর দিকে তাকালে দেখা যায়, কর্তা বোটের ছাদে তাঁর বিপুল দেহ ইজি-চেয়ারের উপর ছড়িয়ে দিয়ে তন্দ্রামগ্ন, পাশে তাঁর শখের বন্দুক রয়েছে পড়ে, বুদ্ধু চাকর দূরে বসে তামাক সাজছে। অন্ধকার হয়ে আসে, ঘুম নেমে আসে দুই বোনের চোখে, ধীরে ধীরে চলে যায় বোটের ভিতরে নিজেদের বিছানায়, সে রাত্রের রহস্য—তাদের মনের উপর চাদর বিছায়, ফুরফুরে হাওয়া হাত বুলিয়ে যায় মাথায় গায়ে।

সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম ভেঙে যেতেই মেয়ে দুটি নেমে পড়েছে চরে যেখানে বোট বাঁধা ছিল রাত্রিবেলা। শেষরাতের

ম্লান চাঁদ তখন আকাশের গায়ে আঁকা, সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস লাল ছটা চিত্রকরের তুলির নির্ভীক পোঁচের মতো লাগিয়েছে লাল আর সোনা পূর্বদিগন্তে। মেয়ে দুটি ভোরের আলোর ম্লান ছায়াতে মাঝে মাঝে ঠোকর খেতে খেতে পা ফেলে চলেছে। দাসী পিছন থেকে বলছে, 'সাবধান দিদি, এসব মড়ার হাড়, পায়ে লাগে না যেন।' ছোট ছোট পাখি সকালবেলায় বাতাস পেয়ে কিচিরমিচির করছে, তারা মড়ার মাথার ভিতর নির্ভয়ে বাসা বেঁধেছে, ভূতের ভয় তাদের একেবারেই নেই। এই হল পল্লীগ্রামের শ্মশান।

মেয়েরা যখন বেড়িয়ে বোটে ফিরল মা তখন রান্নার আয়োজন করে ফেলেছেন। ঘাটেই রান্নাখাওয়া সেরে বোট খুলে দেবে, তারই আয়োজন চলেছে—এমন সময় হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল—মেয়েরা বাইরে ছুটে গিয়ে দেখে গুপীদাসী স্নান করতে নেমে গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে, মাঝিমাল্লরা তাকে ডাকাডাকি করে ওঠাবার চেষ্টা করছে। বাবুমশায়ের কাছে বকশিশের আভাস পেয়ে চার-পাঁচজন ভোজপুরী দরোয়ান লাফিয়ে পড়ে গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে গুপীকে টেনে তুলল, সে বেঁচে গেল, দরোয়ানও বকশিশ পেল।

কর্তা ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক, গরিবের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। যদিও তিনি তখনকার দিনের বড়লোকের ঘরের ছেলেদের দুর্বলতা এড়াতে পারেননি, তবু সকলের প্রতি তাঁর

অমায়িকতা উদারতা তাঁকে বন্ধুবান্ধব মহলে জনপ্রিয় করেছিল। এ যাত্রা তাঁর দৌড় ছিল মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত, রাস্তায় হুগলীর ইমামবাড়ি থেকে আরম্ভ করে হংসেশ্বরী পর্যন্ত অনেক কিছু দেখা হল। সেকালে শিশুচিত্তের লোভনীয় জিনিস ছিল কৃষ্ণ-নগরের পুতুল আর শান্তিপুরী ফেনীবাতাসা, কত যত্নেই না সেগুলি সঞ্চিত হত বোটের তক্তার নিচে, আর দুই বোনের সমস্ত দিন মন পড়ে থাকত সেগুলির উপর। বার বার করে দেখা আর নেড়েচেড়ে তুলে রাখা—এই ছিল সমস্ত দিনের কাজ। গানে গল্পে, নানা প্রকার ছোটখাট অভিজ্ঞতা জড়ানো বোটের দিনগুলি জলের স্রোতের মতো অবাধে কেটে গেল, মাসখানেক পরে সকলে বাড়ি ফিরল। কোথায় গেল সেই মুক্ত আকাশ আর বাধাহীন গঙ্গার প্রবাহ—বোটের জীবনটা সবসুদ্ধ যেন বৃহৎ বনেদী ভিটের অন্দরের অন্তরালে মিলিয়ে গেল স্বপ্নের মতো।

একদিন হঠাৎ শোনা গেল কর্তা বাইশ বিঘে জমির উপর গঙ্গার ধারে বাড়ি কিনেছেন। তাঁর বড় শখের ছিল সেই বাগান। সেবার গরমে সেইখানেই বেড়াতে যাওয়া স্থির হল। বাড়িসুদ্ধ সকলেই প্রায় গেল, কর্তার বোনের ছেলে-বৌরাও এবার বাদ পড়লেন না। তখনকার দিনে বাগানে বেড়াতে যেতে হলে কুক্ কোম্পানিতে ঘোড়ার অর্ডার দেওয়া হত, মাঝে মাঝে ঘোড়া বদল করে তবে

লোকে বাগানে পেঁছত। ছ'ক্রোশ অন্তর অন্তর সহিস ঘোড়া নিয়ে গাছের তলায় আগের দিন গিয়ে বাসা বেঁধে থাকত। কর্তার বাগান-যাত্রাও ঠিক এই ভাবে হয়েছিল। ক্রমে সমস্ত পরিবার নিয়ে ল্যাণ্ডো গাড়ি ও প্রকাণ্ড দুটো কালো জুড়ি বাগানের গেটে পেঁছল। দূর থেকেই একসার বকুলগাছ চোখে পড়ে— রাশি রাশি ফুল বিছিয়ে আছে গাছের তলায়। সেদিন বাবু আসবেন বলে মালীরা বিশেষ করে শাদা কাঁচের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়েছিল, তা থেকে জল ছিটিয়ে পড়ছিল আবহাওয়াকে ঠাণ্ডা ক'রে। ফ্রেঞ্চ স্টাইলের শাদা পাথরের মূর্তি সাজানো রয়েছে এখানে সেখানে—আর ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধে আমোদ-করা লাল রাস্তা এঁকে বেঁকে ঘুরে গিয়ে কুঠিতে পেঁচেছে। তারই দু'ধারে দেশী ও বিলিতী ফুলের কেয়ারি। কোথাও গেটের উপর হলদে গোলাপ ফুটে আছে, লোহার তারের উপর তাকে উঠিয়ে দিয়ে সযত্নে সাজানো হয়েছে। মাঝে একটা ঝিল; বেল জুঁই, আরও নানারকম ফুলের গাছের বাহার তারই চারিদিক ঘিরে, নানা জাতের পাখিও জলে ভাসছে, ময়ূর ও সারস বাগানে ছাড়া আছে। দুই প্রকাণ্ড কচ্ছপ ঝিলের জলে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছে। মালীরা তরকারি লাগিয়ে জল দিচ্ছে, আলু-কপির চারা সাজানো হয়েছে, নানাবিধ শাকসবজিরও অভাব নেই। কুঠির ভিতর সমস্ত ফার্নিচার তখনকার ফ্যাশানমতো অস্‌লার কোম্পানি থেকে কেনা, মেহগনির

উপরে মখমল দিয়ে মোড়া। ঝাড়লণ্ঠনও তখনকার দিনের হাল-ফ্যাশনের তৈরি।

কর্তার মনটা ছিল শৌখিন, অনেক কারুকার্য দিয়ে বাগান-বাড়ি সুশোভিত করবার চেষ্টা করেছিলেন—তাঁর সেই চেষ্টার পিছনে ছিল সৌন্দর্যপিপাসা। অনেক দিন পরে ছেলেমেয়েরা শহরের আবহাওয়া থেকে বেরতে পেরে বেঁচে গেল। সকলে অতি স্ফূর্তিতে গঙ্গাস্নান, আম কুড়নো, কুঁড়োজালি নিয়ে খেলা—এই সব আমোদে দিন কাটাতে লাগল। এদিকে চাকরমহলে ভূতের ভয় দেখা দিল—ঝিরা বলে, 'দিনে বেশ থাকা যায়, রাত্রি হলেই কেমন গা ছমছম করে।' আর রাত হলে চাকররা নিমগাছে বেল-গাছে ছায়ামূর্তি দেখতে থাকে এবং দিনের বেলা তার থেকে অদ্ভুত গল্পগুজব তৈরি হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার সময় সেই সব গল্প শুনতে শুনতে ছেলেরা আতঙ্কে বিছানায় আশ্রয় নিত, তাদের ভালো করে চোখ খুলতেও ভয় করত—বুঝি বা সেই সব বিচিত্র প্রেতাত্মা তাদের মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর কখন ঘুমের কোলে ঢুলে পড়ত মনেও থাকত না, ভয় যেত কেটে। একটা সাহেবী ভূতের উপদ্রবেই চাকরবাকর বেশি অস্থির—এই বাগানটা আগে এক সাহেবেরই ছিল। আবার তার গোরও আছে সেই বাগানে—সেজন্য এই বাগান কিনতে কর্তাকে অনেকে নিষেধ করেছিলেন। যাই হোক, হিন্দু ব্রহ্মদৈত্যগুলো সেই সাহেব

ভূতের কাছে হার মেনেছে, বন্ধু চাকর কেবল বলে, 'ওরা পারবে কেন—সাহেব রোজ রাত্তে বন্দুক ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ায়।'

এদিকে জ্যৈষ্ঠমাসের গরম বেলা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, সন্ধেবেলা দক্ষিণে হাওয়া ওঠে, গরমে ক্লান্তি-জড়ানো অবসাদ আনে মনে। বেলফুলের স্নিগ্ধ গন্ধ দিনের শেষে বাতাসের পেয়ালা থেকে উপচে পড়ে। এমনি করে সরল দিন সহজভাবে কেটে যায়। হঠাৎ কর্তা একদিন তাঁর বড় ভাগনেকে ডেকে বললেন, 'যতি, আমার বাগান বন্ধুবান্ধবকে দেখানো হয়নি, অনেক দিন তাঁদের নিমন্ত্রণও করিনি, যাও, তুমি কলকাতা গিয়ে সকলকে নিমন্ত্রণ করে এস।' যতীনবাবু যেতে প্রস্তুত হলেন, তবে বললেন যে সব ব্যবস্থা শেষ হতে এক সপ্তাহ লাগবে।

তার পরদিন থেকে যেন রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন শুরু হল। বাগানের চারদিকে তাঁবু পড়তে লাগল, নিমন্ত্রিতদের চাকর-বাকরদের থাকবার জন্য দরমার ঘর তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামসুন্দর ওস্তাদ ও মতিলালবাবু হাজির হলেন। মতিবাবুর চেহারাটি ছিল মজার, কাঁচায় পাকায় ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, একটি থেলো হুঁকো হাতে সামিয়ানার নিচে বসে থাকতেন, আর কাজের চেয়ে হাঁকডাকেই রাখতেন উৎসব সরগরম করে। বাবুমহলে মোসাহেব নামে তাঁর খ্যাতি ছিল, তাঁর কাজই ছিল কাপ্তেন মহলে পসার জমানো। তখনকার দিনে এই রকম একটি করে গৃহপালিত মানুষ

জমিদারবাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের শোভা বর্ধন করতেন। বাবুদের সঙ্গে থেকে তাঁদের প্রশংসা করাই ছিল তাঁদের কাজ। কিন্তু এই সব লোকের কথাবার্তা কেউই সত্য বলে গ্রহণ করত না। এমন কি তিনি নিজেও না। এখনকার দিনে ঐরকম লোকের আর দরকার হয় না। শ্যামসুন্দর ওস্তাদের তখন অল্প বয়েস, নতুন এসেছেন কলকাতায়, এঁদের বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে তাঁর ভবিষ্যতের পথ খুলে গেল, পরবর্তী যুগে এই শ্যামসুন্দর একজন সুশিক্ষক নামে কলকাতা সমাজে পরিচিত হয়েছিলেন। যাই হোক এঁদের হাতেই ভার পড়ল গানবাজনার আসরের। ঈশ্বরীবাবু এসে হুকুম নিয়ে গেলেন মেয়েদের মনের মতো কি কি গান হবে। মতিবাবু হাঁকডাক করে বাইরের বাড়িতে কাজের আবহাওয়া জাগিয়ে রাখলেন। এদিকে ভিয়ানকর বামুন এসে নানা রকমের মিষ্টি তৈরি শুরু করে দিল। কলকাতা থেকে রাশি রাশি মিষ্টি ও রাবড়ির আমদানি হল। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক আসবেন, তার উপযুক্ত উদ্যোগ হতে লাগল।

ভগবত মালী গাঁদা আর গোলাপ দিয়ে সমস্ত কুঠিবাড়ি সাজিয়ে ফেলল, ছোট তোড়া আর 'বোকে' বাঁধা হতে লাগল। হুঁকো-বরদারের অনবরত তামাক সাজার গন্ধ দক্ষিণ হাওয়াতে অন্দরে ভেসে আসছে। মালাকার জুঁই ও বেলের রাশ রাশ মালা দিয়ে গেল। হঠাৎ যেন মনে হল বাগানটার চেহারা বদলে গেছে, যেন কোন

ইন্দ্রপুরী। দুপুর থেকেই নিমন্ত্রিতের দল আসতে লাগলেন। আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব অনেক এসেছেন। সমস্ত রাত ধরে গান বাজনা মজলিস চলল। গাছের তলায় তলায় গানের আসর, ঘন পাতার ভিতর দিয়ে জাপানী ফানুসের আলো ঝিকমিক করে উঠছে। অন্দরবাড়ি থেকে বাইরের বাড়ির গোলমাল মেয়েরা শুনতে পাচ্ছে। এরকম উৎসবের আভাস তখনকার দিনে মেয়েরা দূর থেকেই পেত, তবু সবসুদ্ধ উৎসবের উত্তেজনা থেকে তারাও বঞ্চিত হত না। খাওয়ার হিড়িক চলল প্রায় সমস্তরাতব্যাপী—উৎসবের জের চলল দিন তিনেক ধরে। তৃতীয় দিনে সব চুপচাপ হয়ে এল, ক্লান্ত দেহমন নিয়ে বন্ধুবান্ধব বাড়ি ফিরলেন—'নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী।' কেবল উৎসবের বাসি ফুলের মালা, ঝরা গোলাপের তোড়া এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে। ফুলদানির ফুল এখনো ম্লান হয়নি, উৎসবের মোহ এখনো যেন মোছেনি তাদের গন্ধ থেকে।

ভোর চারটের সময় হঠাৎ বৈঠকখানা থেকে একটা হৈ হৈ শোনা গেল, ঘুম ভেঙে গেল ছোট মেয়ের, তার ঝিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ঝি বল্ তো।' ঝি বলল, 'জান না দিদি, একেই বলে এই হাসি এই কান্না। কাল লোক চলে যাবার পর থেকে বাবার যে খুব অসুখ করেছে, তাই সকলে ব্যস্ত।' সকালে দেখা গেল ডাক্তার নীলমাধববাবুর গাড়ি বাগানের

দরজায়। সমস্ত দিন চিকিৎসা চলল কর্তার, রক্তবমি কেউ বন্ধ করতে পারল না। ছত্রিশ বৎসর বয়সে বনেদী ঘরের অভিশপ্ত জীবন গঙ্গার শান্ত তীরে বিশ্রাম নিল। তাঁর উদ্দাম জীবন, উৎসবের উন্মত্ততায় নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে চলে গেল। কেউ জানল না কিসের দুর্দমনীয় বেগ তাঁকে এমন নির্মমভাবে আত্ম-হত্যার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মধ্যে সত্যিকার একটি শিল্পী ছিল, কিন্তু সে ফুটতে পায়নি। তারই আবেগে নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে চলে গেলেন কোন্ অজানা ভাগ্যপথে। তাঁরই প্রতিহত শক্তি নিয়ে পরবর্তী যুগে যে দুজন শিল্পীর আবির্ভাব হল, তাঁরাই শিল্পজগতে নতুন রূপ সংযোজনা করলেন, আর বাঙলার রুচিকে ফিরিয়ে দিলেন নব নব শিল্পবিকাশের পথে।

সেই পুরনো বাড়ির পুরনো কালকে ভাবতে ভাবতে কখন ঝিমিয়ে পড়েছিলুম আমার চৌকিখানার উপর তা বুঝতেও পারিনি। হঠাৎ যেন কার কোমল স্বরে মনটা নাড়া খেল, তন্দ্রার ঘোরেই যেন শুনলুম কেউ বলছে, 'এই তো আমার একাধিক সহস্র রজনীর একটি গল্প শেষ করলুম, ভোর হয়ে এল, আমি এইবার যাই। ঐ বড় বাড়ির আর-এক ইতিহাসের পালা শোনাব তোমায়, তুমি যখন এসে বসবে এমনি করে এই বারান্দায় আর-একদিন। এমনি ক্লান্ত সন্ধ্যায় শুরু করব আর-এক যুগের কাহিনী।'

একদিকে বনেদী সাতমহলা বাড়ির প্রকাণ্ড ছাদ আর একদিকে নিস্তব্ধ ঠাকুরদালানের লম্বা থামগুলো। সেই দালানে কত মানুষই না নিদ্রামগ্ন। এ বাড়িতে কত লোকের বাসা চিনিও না, কিন্তু রাতে দেখি সকলে এক-একটা জায়গা দখল করে শুয়ে পড়েছে দালানটা যেন সাধারণের শোবার ঘর। সকালবেলা আবার ঐসব পরিচিত-অপরিচিতরা কে কোথায় চলে যাবে কাজের তল্লাসে; কারও খোঁজ থাকবে না; একই গাছে যেমন সন্ধ্যার সময় দিনের পাখিরা ফিরে আসে, দালানটি তেমনিতর মানুষের বাসা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের এক কোণে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে অতীতের কত কাহিনী মনে আসছিল, বিস্মৃত সব দিনকে নতুন করে অনুভব করছিলুম। দূরে গলির কোনো উপরতলার ঘর থেকে বাইজীর গলায় বেহাগ শোনা যাচ্ছে। দমকা হাওয়ায় ভেসে আসছে সুর নিস্তব্ধতাকে আলোকিত করে। অন্ধকারের মধ্যে ভিটের মুমূর্ষু আত্মাটা যেন মাথা নাড়া দিয়ে বলে উঠল, 'জান, ঐ ছিল ইলাইজান বিবির বাড়ি, তার গলাও একদিন এমনি করেই উঠত।

বিবির বেড়ালের বিয়েতে যে ধুম হয়েছিল তা তখনকার দিনে বড়লোকদের হার মানিয়েছিল, আর এখনকার দিনের তোমরা তা তো চোখেও দেখবে না।' সেকালে শৌখিন মেয়েমহলে ঘুড়ি ওড়ানো ছিল ব্যতিক, এবং ঘুড়ির প্যাঁচ খেলায় অনেক কিছু কাহিনী তৈরি হত। ইলাইজান বিবিও বিকেলবেলা ঘুড়ি ওড়াতেন, সেই নিয়ে মুখে মুখে প্রতিবেশীরা খোশগল্প তৈরি করত। এই সব বিচিত্র জীবনধারার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই বনেদী ভিটে দাঁড়িয়ে ছিল নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে মাথা উঁচু করে বাড়ির সামনে গলিটিও অদ্ভুত জায়গা, তাতে কত রকম লোকেরই না আড্ডা। গলির দুধারে বাড়ির চেহারা অতি নোংরা, নোনাধরা দেয়াল, বাইরের থেকে দরজার ভিতর দিয়ে অন্তঃপুরের একটা রহস্যাচ্ছন্ন চেহারা চোখে পড়ে। ফুটপাথের অপর প্রান্তে মস্ত বটগাছ, শিব-মন্দির ফুঁড়ে বেরিয়েছে গলির উপরে খানিকটা ছায়া বিস্তার করে। প্রায়ই দেখা যেত শিবের প্রকাণ্ড বুড়ো বলদ, নিশ্চিন্তমনে নিচের তলার অধিবাসীদের পরিত্যক্ত আবর্জনা তরকারির খোসা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিচের তলায় নানারকম ব্যবসায়ীর বাসা, একঘর সেকরা, দরজি, তেলের গুদাম, আরও কত কি। উপরের তলায় সন্ধ্যা হতেই চোখে পড়ত বিচিত্র সাজগোজ করে নর্তকীর দল দোতলার সরু বারান্দায় নানা ভঙ্গিতে পুতুলের মতো বসে। এদের জীবনের ধারা সব অদ্ভুত. বাইরের লোক এদের ঘৃণা করে,

যারা এদের বন্ধু তারাও দেখে এদের হীন চোখে। গলির চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে খোলা উঠনে এসে গলি শেষ হয়েছে, সেই খোলা জমির দুদিক ঘিরে উঠেছে তিনতলা দালান। সেখানে পেঁছিলে জন-সমুদ্রের কথা ভুলে যেতে হয়। বাড়িটি রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের মতো। সেই প্রাসাদের মধ্যে তখন চলেছিল বাঙলার নতুন শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিবেশনের পালা। যাঁদের শিশুচিত্তের মধ্য দিয়ে এই নতুন খেলার আয়োজন হচ্ছিল, ভাগ্য তখনো তাঁদের গড়ছিল অজ্ঞাতলোকে। তাঁদের মধ্যে একজন তখনো অপ্রত্যক্ষ-ভাবে বিচরণ করছিলেন, যাঁর শক্তির প্রকাশ বাইরের জগতে ছিল তখনো নিরুদ্ধ, কিন্তু অন্তরের অন্তঃপুরে বিচিত্র স্বপ্নলোকে তাঁর অপ্রতিহত গতি জীবনযাত্রার পরিবেষ্টন থেকে অহরহ আহরণ করছিল পাথেয়।

এবাড়ি আর ওবাড়ির জীবনধারা তখন দুই পথে বইছে। মহর্ষিদেবের বাড়িতে চলছে তখন নতুন সৃষ্টির কাজ, সনাতনী প্রথা ও প্রাচীন সংস্কারকে পরিমার্জন করে তৈরি হচ্ছে সভ্যতার নতুন রূপ। সেকালে মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া সে কেবল ওবাড়িতেই সম্ভব হয়েছিল। সমাজের পাথরের দেয়াল ভেঙে ফেলে মেয়েরা বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। তখনকার দিনেও ওবাড়ির মেয়েরা ঘোড়ায় চড়েছেন, স্টেজে নেমেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন,

গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। সমাজ আতঙ্কিত চিত্তে তাকিয়ে থাকত তাঁদের দিকে একটা উদ্ভট কিছু দেখবার জন্য। তাঁদের চালচলন সমাজের চোখে তাক লাগিয়ে দিত। শেষে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না করতে পেরে সাধারণ লোকে বলত, 'ওঁরা যে ব্রহ্মজ্ঞানী।' অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের লোকদের পক্ষে সবই সম্ভব। এই যুগান্তর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত নবসংস্কৃতির এই বিকাশ ঘটেছিল বাঙলার এই পরিবারের মধ্যে দিয়ে, মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মিলিত চেষ্টায়। সেই প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার ঘরে ঘরে।

এদিকে সৌদামিনী দেবীর সংসারও নতুন পুরনোর দোটানায় দোল খাচ্ছিল। এ-বাড়ির গিন্নী সৌদামিনী দেবীর জীবনেও সেই সময় অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, নানা প্রকার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংসারের চলতি পথে তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে নিয়ে তখন দাঁড়িয়েছেন। সৌদামিনীই তখন তাদের একমাত্র অভি-ভাবিকা। অর্থ থাকলে পরামর্শ দেবার লোকের অভাব হয় না, অনেক আত্মীয়স্বজন গায়ে পড়ে সহানুভূতি দেখালেন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক বুদ্ধির গুণে সেই শুভাকাঙ্ক্ষীদের দূরে ঠেকিয়ে রাখলেন। তাঁর এমন একটি দূরদর্শিতা ও স্থির সংকল্প ছিল যে সকলেই তাঁকে মানতে বাধ্য হত। আশ্রিতদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম স্নেহ। তিনি তখনকার সামাজিক আদর্শ অনুযায়ী যথার্থই মাতৃমূর্তি ছিলেন। তখনকার দোটানার মধ্যে ছেলেদের

তিনি আঁকড়ে রাখতে চাইলেও সম্পূর্ণ আগলানো সম্ভব ছিল না। জ্যাঠামশায়ের বাড়ির প্রভাব এসে পড়ছিল তাদের শিক্ষা-দীক্ষায়, কিন্তু তখনো একেবারে খসে পড়েনি পুরনো চালচলন। সৌদামিনীর ঘরে পুজোপার্বণের জের চলেছিল তখনো সমভাবেই, তার মধ্যে বসন্তপঞ্চমী দুর্গোৎসব বেশি করে মনে পড়ে।

প্রতি উৎসবেই মেয়েদের তখন বিশেষ সাজ ছিল। বাসন্তী রঙে ছোপানো কালোপেড়ে শাড়ি, মাথায় ফুলের মালা, কপালে খয়েরের টিপ—এই ছিল বসন্তপঞ্চমীর সাজ। দুর্গোৎসবে ছিল রঙ-বেরঙের উজ্জ্বল শাড়ি, গা-ভরা গয়না, চন্দন ও ফুলের প্রসাধন।

দোলপূর্ণিমারও একটি বিশেষ সাজ ছিল, সে হল হালকা মসলিনের শাড়ি, ফুলের গয়না আর আতর-গোলাপের গন্ধমাখা মালা। দোলের দিন শাদা মসলিন পরার উদ্দেশ্য ছিল যে আবীরের লাল রঙ শাদা ফুরফুরে শাড়ির উপর রঙিন বুটি ছড়িয়ে দেবে। শৌখিন লোকেরা তাই সন্ধেবেলা ঢাকাই বা শান্তিপুরী ধুতি-চাদর আর মেয়েরা ঢাকাই মসলিন পরতেন। দুর্গোৎসব দেখতে যেতেন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি। দস্তুরমতো লাল বা নীল ঘেরা-টোপওয়ালা পালকি চড়ে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে হত। প্রতি বাড়ির পালকির ঘেরাটোপের রঙ ছিল এক-একরকম। জোড়াসাঁকোর ছিল লাল জমি আর হলদে পাড় আর পাথুরেঘাটার ঠাকুরবাড়ির ছিল নীল জমি আর শাদা পাড়। এই ঘেরাটোপের রঙ দেখে

বাইরের লোক বুঝতে পারত কোন্ বাড়ির পালকি যাচ্ছে। এমন কি গঙ্গাস্নান করতেও মেয়েরা যেতেন ঢাকাওয়ালা পালকিতে চড়ে। সেই অসূর্যম্পশ্যাদের চোবানো হত ঘেরাটোপসুদ্ধ গভীর পবিত্র জলে, পুণ্য অর্জন করা তো চাই। তবে যতই অদ্ভুত লাগুক তখন ওই উড়ে বেহারাদের হুমকি-হুয়ার মধ্যে ভারি একটা রহস্যজনক আনন্দ অনুভব করা যেত, বিশেষত যখন দুর্গোৎসব দেখতে পুজোবাড়ি যেতেন মেয়েরা; মনে পড়ে পালকির ভিতর থেকে জন তিনেক ছোট ছোট মেয়ে সন্তর্পণে পর্দা সরিয়ে রাস্তার চেহারাটা কৌতুকভরে দেখে নিচ্ছে। একপাশে দরওয়ান চলেছে, লাঠি হাতে, মাথায় মস্ত লটকান রঙের পাগড়ি, গলায় সোনার বড় বড় দানাওয়ালা মালা, ইয়া চাপদাড়ি। একদিকে পুজোয় পাওয়া রঙিন শাড়ি পরনে, হাতে অনন্ত, গলায় মোটা বিছেহার, দর্পভরে বাহু দুলিয়ে চলেছেন 'লিচুর মা', দরওয়ানের সঙ্গে তার গল্প জমেছে বেশ, তারই মাঝে উড়ে বেহারাগুলো তাদের হুমকি-হুয়া সুর খাদ থেকে পঞ্চমে তুলে গতিকে দ্রুত করছে, তখন ঝিয়ের মুখে বেরিয়ে পড়ছে মধুর সম্ভাষণ, 'মর্ মিনসেগুলো, এত দৌড়স কেন?' ওদিকে লিচুর মা'র মুখঝামটা খেয়ে দরওয়ানের চাপদাড়ি উঠত ফুলে, সেই বা চাল দিতে ছাড়বে কেন, গাল ফুলিয়ে হাঁক দিয়ে উঠত, 'সামাল যাও।' ধমক খেয়ে বেহারাদের গতি মন্দ হয়ে আসত, হুমকি-হুয়ার বদলে শুরু হত গালি।

মেয়েদের মধ্যে কোনো কৌতুকপ্রিয়া ফিক করে হেসে বলত, 'দেখছিস ভাই, এইবার ওরা ঝিকে গাল দিচ্ছে। লিচুর মা বুঝতেও পারছে না ওদের উড়ে ভাষা কি মজার।' এদিকে চলেছে রঙ-বেরঙের ঘোড়ার গাড়ি, ফিরিওয়ালার টানা সুরে নানা প্রকার হাঁক আসত একটা অজানা জগতের সাড়া নিয়ে। তবুও পালকি চড়াটা তখনকার দিনে একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। এই সময় মেয়েরা সর্বসাধারণের সঙ্গে পথে এসে দাঁড়াতে পারত, ঘেরাটোপের ব্যবধানের মধ্যেও একটা মুক্তির স্বাদে উঠত তাদের মন ভরে। কৌতূহলবশত পর্দা বেশি সরালেই দাসীর ধমক খেতে হত, 'কাণ্ড দেখ মেয়েদের, গা-ভরা গয়না, রাস্তার লোকগুলো সব দেখে ফেলুক', ঝি পর্দা বন্ধ করে দিত, তখন যে তিমিরে সেই তিমিরে। কেবল রাস্তার লোকের পায়ের আওয়াজ আর ছোট-খাট টুকিটাকি গল্পগুজব নানা ছবি মনে আনত। এমনি করে জনসমুদ্র পার হয়ে পুজোবাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে পালকি এসে নামত উঠনে। আরতির বেলা তখন শুরু হয়েছে, অষ্টমী-পুজোর হৈ হৈ চলছে পুজোর দালানে, নাটমন্দিরে বাজছে সানাই। এরই মধ্যে আরো কত দর্শক এসেছে, প্রত্যেকের দৃষ্টি প্রত্যেকের গয়না কাপড়ের দিকে। প্রতিমার সামনে বসল সব ছেলেমেয়ের দল। পুরোহিত এক হাতে প্রকাণ্ড গাছপ্রদীপ আর এক হাতে শাদা চামর নিয়ে শুরু করলেন আরতি। তারই সঙ্গে কাঁসরঘণ্টার

আওয়াজ, কানে তালা লাগবার যোগাড়। তারপর মায়ের প্রসাদী বাতাসা ছেলেমেয়েদের হাতে বিলনো হত, সন্তুষ্টমনে শিশুরা তাই নিয়ে পালকি চড়ে বাড়ি ফিরত। রাস্তায় তখন গ্যাসের মিটমিটে আলো জ্বলছে, তারই আবছায়াতে মানুষ ভালো করে নজরে পড়ে না, কাজেই পর্দা ফাঁক থাকলে দাসী আপত্তি করত না। এই সুযোগে ঘেরাটোপের বন্ধন এড়িয়ে খোলা হাওয়াতে নিশ্বাস ফেলে বাঁচত তারা।

প্রকাণ্ড পরিবাবের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন আমার মাসিমা সুনয়নী দেবী। সনাতন প্রথা অনুসারেই তাঁকে চলতে হত, সংসারে যেমন সব সাধারণ গৃহিণীরা গৃহিণীপনা করে থাকেন। অসংখ্য ছেলেমেয়ে চাকরবাকরের বৃহৎ পরিবার, তারই মাঝখানে মাসিমা কোন্ দূরান্তরের মানুষ যেন। মেয়েলি গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা সবের মধ্যেই তিনি নিজেকে সমানভাবে মিলিয়ে দিয়েছিলেন, তবু তাঁর মন নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি জীবনের খুঁটিনাটি অবান্তর জিনিসের মধ্যে।

বৃহৎ প্রাসাদের এক কোণের একটি ঘরে মাসিমা তাঁর আর্টের সৌধ রচনা করেছিলেন। তাঁর ঘরের সামনে ছিল একটি ঢাকা বারান্দা, সেই বারান্দায় আমরা ছেলেমেয়েরা মিলে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলা কত করেছি, কিন্তু মাসির মনকে আমাদের দুরন্তপনা দিয়ে বিক্ষিপ্ত করতে পারিনি। মাসির দরজা সমান ভাবেই বন্ধ থাকত। মাঝে মাঝে আমরা শুনতে পেতুম সেতারের ঝংকার। লোকারণ্য বাড়ি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আপন

জগতের মধ্যে সংগীতসাধনায় মগ্ন থাকতেন তিনি। দ্বিপ্রহরের পর বাড়িসুদ্ধ লোকের যখন বিশ্রামের সময়, মাসি তখন আপন মনে ইংরেজি ডিক্সনারি নিয়ে পড়াশুনো করতেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর ছেলেরাও মহোৎসাহে খেলা করে বেড়াত। মাসির দরজার কাছে আমরা ঘুরে বেড়াতুম আর যত পারি চেঁচামেচি করতে ছাড়তুম না। অতিরিক্ত ব্যাঘাত হলে দরজা খুলে মিষ্টি সুরে বলতেন, 'এখন যা তোরা, গোলমাল করিস নে, সন্ধে হলে তোদের গান শোনাব।' মাসির রহস্যময় সাধনার প্রহেলিকা আমরা কিছুই বুঝতে পারতুম না। সেই জন্যই তাঁর ঘরের বারান্দাটা আমাদের কাছে এত কৌতূহলের বিষয় ছিল। সেইখানটাই ছিল ছেলেমেয়েদের যত জটলা করবার জায়গা।

সন্ধের সময় তিনি প্রসাধন সেরে দিদিমার বসবার ঘর উপরের হলে যেতেন। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরতেন, আমাদের ছোট-ছোট ভাইবোনদের ঐসময় অভিনয় করতে শেখাতেন, সেইসঙ্গে গান চলত। মাসি নিজের কল্পনারাজ্যের খোরাক আপনিই সংগ্রহ করে নিতেন। তাঁর শিল্প-শিক্ষা সেইজন্যই অতি স্বাভাবিক-প্রণালীতে অগ্রসর হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁকে তুলির কাজ শুরু করতে দেখেছি, সেতারের জায়গায় রঙ-তুলি নিয়ে বসতেন। মাসির স্বামী ছিলেন কাজের লোক, তখনকার দিনে কলকাতার বড় অ্যাটর্নি। অনেক শিশুর মা হয়েও, বৃহৎ সংসারের গৃহিণী

হয়েও মাসি ছবি এঁকেছেন অজস্র এবং সেই ছবি অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্রের প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বিশিষ্ট। তাঁর ভাইদের এতবড় ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এড়িয়ে তাঁর শিল্পধারা নিজেকে প্রকাশ করেছিল অতি সহজেই।

তাঁর চিত্রেব বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ-মহাভারত এবং কৃষ্ণলীলা। সেকালের মেয়েরা অতি সহজেই এইসব পৌরাণিক কাহিনী মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারতেন। তাঁদের কল্পনাজগতে এইসব প্রাচীন সাহিত্য বিচিত্র রূপরস নিয়ে দেখা দিত। তাঁর বাড়িতে গেলে বুঝতে পারতুম মাসি কোন্ জগতে বাস করেন। ঘরের প্রতি দেয়াল প্রতি কোণ পৌরাণিক বিষয়ের ছবিতে ভরা। টেকনিক ছিল তাঁর নিজের, ভাব ছিল তাঁর অন্তরের স্বপ্নজড়িত কল্পনার প্রতিরূপ। এই আমার মাসি, একদিকে তিনি বৃহৎ হিন্দুপরিবারের গৃহিণী, ঘোরতর সংসারী, আর-একদিকে সংসারবৈরাগী শিল্পসাধিকা। তাঁর সমস্ত চেহারার মধ্যে চোখদুটি ছিল স্বপ্নজড়িত, যা দিয়ে তাঁর সমস্ত ভাবকে তিনি যুগ দিয়ে গেছেন—এই ভাবের ছায়া তাঁর সমস্ত মুখের উজ্জ্বলতাকে উৎকর্ষ দিয়েছিল।

এখনকার দিনে কালিঘাটের পটের লাইন আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু তার বহুপূর্বেই একজন বঙ্গমহিলা পটের ধারাকে গ্রহণ করে ছবি এঁকেছিলেন, তিনি সুনয়নী দেবী। পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করে মানুষের জীবনযাত্রার প্রবাহকে

শিল্পধারাতে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর তুলিতে অতি সহজ-ভাবেই সংসারযাত্রার সমগ্র দিক প্রকাশ পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণের লীলা যদিও তাঁর ছবির প্রধান বিষয়বস্তু তবু তাঁর মন সেই লীলার মধ্যে দিয়ে একটা বিশ্বজনীন রস অনুভব করেছিল। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আজও পর্যন্ত বাংলার মহিলা আর্টিস্টদের মধ্যে সুনয়নী দেবীর স্থান সর্বোচ্চে। আধুনিক ভারতীয় চিত্র-কলার নবউদ্বোধনের যুগে অবনীন্দ্রনাথ যেমন পারশিয়ান ও মোগল টেকনিক গ্রহণ করলেন, গগনেন্দ্রনাথ নিলেন জাপানী ও কিউবিস্টিক টেকনিকের ধারা, তেমনি তাঁদের ভগ্নী সুনয়নী দেবী এবে[illegible]রে জনসাধারণের আর্ট পটুয়া-শিল্পের ভিত্তির উপর তাঁর চিত্রাবলী রচনা করলেন।

পুরনো দিনের কথা অনেক কালের স্বপ্নের মতো ঝাপসা হয়ে এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ দেখা হল মামার সঙ্গে, মনে পড়ে গেল সেই সব দিন—জিজ্ঞাসা করলুম, 'বলো তো মামা, তোমার ছোটবেলার গল্প, কেমন করে তুমি আর্টিস্ট তৈরি হলে, লোকে বলে দাদামশায় তোমার জন্য বড় বড় মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন তোমাকে আর্টিস্ট করে তুলবেন বলে।'

মামা বললেন, 'লোকের ভুল ধারণা শুনিস কেন? তাঁদের কিছুমাত্র চেষ্টা ছিল না যে আমি আর্টিস্ট হই। হাল আমলের

বাপমায়ের মতো নানা শিক্ষাপদ্ধতির চিন্তা করে ছেলেকে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দেবার কোনো চেষ্টা তাঁরা করেননি। বাবার শখ ছিল বাগানের, তিনি একখানা মস্ত বাগান তৈরি করেছিলেন। তাঁর মাথায় সব সময় কিছু-না-কিছু গড়ার প্ল্যান ঘুরত। পশুপক্ষী ভালোবাসতেন তাই তাদের পুষেছিলেন, আমরা ছেলেরা ছিলুম তাদের শামিল হয়ে। গাছপালার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাতুম—কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুই করিনি। বাবার রঙ তুলি পেনসিল চুরি করে ছবি আঁকতুম। পটুয়া হবার বাসনা বা কল্পনা কিছুমাত্র সে সময় মনে ছিল না, সে শুধু ছোট ছেলের শখ। তবে দেখতুম, চারিদিক দেখেছি দুই চোখ ভরে—ওপর পারের গাছগুলো, লাল ছোট জানালাওয়ালা বাড়ি ঝাপসা হয়ে আসত গোধূলির ধূসরতায়, ঘাটের উপর ছায়া আসত নেমে, জলের রঙ হয়ে আসত কালো, তারপর এক-একটি করে বাতি জ্বলে উঠত, গাছের ফাঁকে ফাঁকে মন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ উঠত বেজে, তখন তাকিয়ে থাকতুম। এই দেখাই ছিল আমার শিশুকালের একান্ত আকর্ষণ—গাছপালা পশুপক্ষীকে অনুরাগ নিয়ে দেখতুম, জানতে চাইতুম।

'চাঁপদানির বাগানবাড়ি এই হিসেবে আমার মনের খোরাক জুগিয়েছিল। একটি টাট্টুঘোড়া আর ফিটনগাড়ি, এই নিয়ে রোজ যেতুম বেড়াতে। প্রতিদিন কুমোরের বাড়ি গিয়ে মাটির বাসন

তৈরি দেখে আসতুম। তারা চাক ঘুরিয়ে যখন মাটির গড়ন তুলত, তখন আমার ভারি মজা লাগত, ইচ্ছে করত, অমনি করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমিই বা না কেন মনের মতো ঘটিবাটি তৈরি করি। তাই দেখতে রোজ ছুটতুম কুমোর-বাড়ি। পথে উতোরপাড়ার মুখুজ্যেদের জুড়ি প্রায়ই আমার গাড়ির পাশাপাশি এসে মিলত, মুখুজ্যে হাঁক দিয়ে বলতেন, কার গাড়ি যায়, কার ছেলে? আমার সহিস বলে উঠত, জোড়াসাঁকোর গুনুঠাকুরের বাড়ির। টগবগ টগবগ করতে করতে মুখুজ্যের তেজী জুড়ি তীরের মতো পাশ কাটিয়ে চলে যেত, আমার নধরদেহ টাট্টু বেচারা তার দাপটের পাশে খাটো হয়ে পড়ত।

'বাবামশায় দুটি সাউথ আমেরিকান বাঁদর পুষেছিলেন, ছোট্ট পশমের পুতুলের মতো দুটি প্রাণী। তাদের জন্য নানারকম ফল আসত নিউমার্কেট থেকে, তারা আরাম করে সেই ফলগুলি খেত। আমার ভারি হিংসে হত তাদের দেখে।

'আর বাবার কামিনী কুকুরটাও ছিল তেমনি বাবু—তাকে চান করিয়ে, লোমগুলো আঁচড়ে পাউডার আতর মাখিয়ে ছেড়ে দিত। সে আমাদের কেয়ার করত না। বাবামশায়ের সোফার উপর বেশ আরামে বসে থাকত, সে ছিল জাপানী পুড্‌ল। আর হরিণের নাম ছিল গোলাপী, বাগানের কচি ঘাস খেয়ে সে ঘুরে বেড়াত।

'কাকের ডাকে সকালের আকাশ যখন ঘোলা হয়ে এসেছে

ঝোটনওয়ালা কাকাতুয়া লম্বা শিক বেয়ে উপরে উঠে কাক তাড়িয়ে আসত ছাদে। তারপর চলে যেত যেখানে মা পান সাজতে বসেছেন। সেখানে গিয়ে পানের বোঁটা খেয়ে ঝোটন ফুলিয়ে পিসিমাদের হাতের সন্দেশ খেত, তারপর সকলের আদর কুড়িয়ে ফিরে যেত বাবামশায়ের টেবিলে। এদের যত্ন-আদর আমাদের চেয়ে বেশি ছিল তো কম নয়। বাবা ছিলেন শৌখিন লোক। ছোটবেলা থেকেই দেখতুম তাঁর প্ল্যান করা বাতিক। জ্যোতিকাকামশায়ের সঙ্গে কলকাতায় তখনকার আর্ট স্কুলে ড্রইং শিখেছিলেন, তার পর নিজের ইচ্ছেমতো শখ করে আঁকতেন। আসলে বাড়িঘর সাজানো, বাগান তৈরি, এই সব ছিল তাঁর শখ। নানা রকম প্ল্যান করতে তিনি আনন্দ পেতেন। পশুপক্ষী খুবই ভালোবাসতেন, তাদের সম্বন্ধে ভালো করে জানবারও তাঁর রীতিমতো আগ্রহ ছিল। রথীর বাগান তৈরির শখ দেখে বাবামশায়কে আমার মনে পড়ে। তাঁর টেবিলের উপর ক্যানারি পাখি এবং অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে নানা রকম বই দেখতে পেতুম। দুষ্প্রাপ্য গাছের সন্ধান পেলেই সেটি তাঁর বাগানে আনা চাই।

'কৃষিপ্রদর্শনীতে একটি দুর্লভ গাছ দেখে তার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তখুনি ক্যাটালগ খোঁজ করে দেখলেন তার দাম পাঁচশো টাকা। তাই সই। পাঁচশো টাকার উপর নিজের নাম সই করে রেখে এলেন। তিনি চলে আসবার পর তখনকার দিনের ছোটলাট

সেই একজিবিশন দেখতে যান। এই গাছটির দিকে নজর পড়তেই তিনিও সেটি কিনতে চাইলেন। সেক্রেটারি বললেন, এটি এরই মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে। সাহেব তো অবাক। তখনকার দিনে বাঙলাদেশে গাছের প্রতি অনুরাগী এমন মানুষটি কে, তাঁকে জানবার জন্য সাহেব কৌতূহলী হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি গুণেন্দ্রনাথ। পরদিন বাবামশায়ের কাছে সাহেবের চিঠি এসে হাজির—সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এদিকে গাছ একজিবিশন থেকে ঘরে এনে গাছ-ঘরে সাজানো হয়েছে।

'বাবামশায় চিঠি পেয়ে তাঁর দুই ভগ্নীপতিকে ডেকে বললেন, ওহে নীলকমল, যোগেশ, দেখ তো কি ব্যাপার, লাটসাহেব দেখা করতে আসতে চান, বড় মুশকিলেই পড়া গেল, একটু চায়ের ব্যবস্থা ঠিক রেখো। লাটসাহেবের চিঠির উত্তরে তাঁকে চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠান হল।

'মনে পড়ে লাট ঘোড়ায় চড়ে বেলভিডিয়ার থেকে এসেছিলেন জোড়াসাঁকোয়, কোনো ফর্মালিটি ছিল না। এখনকার আর তখনকার রাজপুরুষদের সঙ্গে এই ছিল পার্থক্য। সাহেবকে চা খাইয়ে বাবামশায় গাছ-ঘরে নিয়ে গেলেন, গাছটির উপর লাটসাহেবের এত বেশি টান দেখে সেটি তাঁকেই উপহার দিয়ে পাঠালেন।

'তখনকার দিনের সংসারযাত্রার আরো একটি ছবি মনে পড়ে।

সেটি হল চাকরবাকরদের। তারা যেন বাবুদেরই শামিল ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই নিজেদের এক-একটি পরিবেশ থাকত আর অন্দরে দাসীদেরও ছিল একটি মজলিস। পরিবারের মধ্যে এদের প্রত্যেকেরই একটি করে নিজস্ব স্থান। তাদের মধ্যে অনেকেরই কথা এখনো মনে পড়ে। ঝিদের মধ্যে কেউ ছিল কলহকুশলা, কেউ বা রসিকা, কেউ বা ছিল স্নিগ্ধস্বভাবা, এখন মনে করলে ভারি মজা লাগে। চাকরদের দল জমত তোষাখানায়। সেখানে ছিল বাবুদের অনুকরণে তাদের তাসের আড্ডা। বাবামশায়ের বিপিন চাকর ছিল বেজায় বাবু। বাবুর যা কিছু অভ্যাস সব সে নকল করতে পারত। তোষাখানায় তাশের আসর জমত, সেই সঙ্গে বাবুদের রুপোর গেলাসবাটি নিয়ে চা-শরবতের ব্যবস্থা বেশ আরাম করেই করত। বুদ্ধু বলে বাবামশায়ের আর-এক পেয়ারের চাকর, সে যেখানেই ল্যাভেন্ডার-মাখানো রুমাল পেত বাবার রুমাল ভেবে আলমারিতে তুলে রাখত।

'অন্যদিকে দেউড়িতে ভোজপুরী দরওয়ানের আর একটি আড্ডা। সে জায়গাটিও ছিল ভারি মজার। প্রধান জমাদারের নাম মনোহর সিং, আর সব ছিল তার সাঙ্গোপাঙ্গ। তার চেহারাটি ছিল লম্বা গৌরবর্ণ, এবং সুদীর্ঘ দাড়ি দেখলে রণজিৎ সিং বলেই ভ্রম হত। রোজ দই মাখিয়ে সে দুবেলা তার দাড়ি সাফ করত, আমার ছেলে-বুদ্ধিতে একদিন খপ করে দাড়ি ছুঁয়ে ফেলেছিলুম। আর

মনোহর গর্জন করে তলোয়ার রুখেছিল। আমি তো ভোঁ দৌড় তেতলায়। তারপর তিন দিন মনোহর সিং আমাদের সিঁড়ি নামতে দেয়নি। নিচের সিঁড়িতে এসে উঁকি মারলেই মনোহর তলোয়ার দেখিয়ে গর্জে উঠত, আর আমি দৌড় দিতুম উপরের দিকে।

'কোচোয়ান-সহিসের আস্তাবলের ছিল আর এক চেহারা। তারা যখন গাড়ি নিয়ে বাইরে যেত তখন সাজগোজের বড়ই ঘটা হত। শামলাধরনের পাগড়ি মাথায় দিত, তার উপরে থাকত তক্‌মা আঁটা। এই তক্‌মা আবার ঠাকুর-পরিবারের প্রত্যেক শাখার এক-এক রকম ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির তক্‌মা ছিল হাতি-আঁকা, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ির ছিল ব্রহ্মামূর্তি, আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ির ছিল পদ্ম। এই তক্‌মা দেখে কোন্ বাড়ির গাড়ি যাচ্ছে লোকে চিনে নিত। বিকেল হলেই সহিসেরা ঘোড়া বের করে সামনের উঠনে দৌড় করাত, যখন চাবুকের এক-এক ঘায়ে চক্রবৎ দৌড়ে বেড়াত তখন কি তেজ তাদের, যেন পক্ষীরাজ। তাদের গাড়িতে জুড়ে শমসের কোচোয়ানকে দাঁড়িয়ে হাঁকাতে হত। তারপর সেই গাড়ি করে বাবামশায়ের সঙ্গে কোন্নগরের বাগানে রওনা হতুম। সেখানে গিয়ে বাবুরা তাস খেলতে বসতেন, আমি চাকরদের সঙ্গে বাগানে ঘুরে বেড়াতুম। ঠিক সামনেই ওপারে পেনিটির বাগানে তখন রবিকাকা জ্যোতি-কাকামশায়েরা থাকেন।

'সাঁতার বাবামশায়ের ছিল একটা আনন্দ, সাঁতরে গঙ্গা এপার-ওপার হতেন। আমাকে সাঁতার শেখাবার জন্য চাকরবে বলতেন গামছা কোমরে বেঁধে ছুঁড়ে পুকুরে ফেলে দিতে, যাতে সাঁতার শেখা আমার পক্ষে সহজ হয়। মা আর পিসিমারা এই সব দেখে কান্নাকাটি আরম্ভ করে দিলেন, ছেলেটা কোন্ দিন বেঘোরে প্রাণ হারাবে এই ছিল তাঁদের উদ্বেগ। তাঁদের কাতর আবেদনে আমার উপর বাবামশায়ের এই সব শিক্ষার চাপ শিথিল হয়ে এল।

'এই কোন্নগরের বাগানে শিশুকাল আনন্দে কাটিয়েছি, বহু-রূপীর নাচ দেখে, পোষা কাঠবিড়ালীর ছানা নিয়ে, খবরের কাগজের নৌকো ভাসিয়ে। স্নানযাত্রায় তখন হত ভারি ধুম। রাতের গতি দিনের গতি বয়ে চলেছে, শত শত নৌকো-বজরার সে দৃশ্য এখনো মনে পড়ে—শিশুজীবনের সে দিনগুলো ভুলবার নয়।

'আমার বয়স তখন নয়, এই সময় চাঁপদানির বাগানবাড়িতে এক-দিন যখন আমরা আরামে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলুম এমন সময় এল এক ভয়ঙ্কর দুঃখের রাত্রি। সে যেন কালজ্যৈষ্ঠের কালো মেঘ, আমার মায়ের এবং আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে নিমেষেই শেষ হয়ে গেল, বাবার হঠাৎ মৃত্যু হল। বড় আঘাত পেয়েছিলেন মা। তার পরদিন কোথায় কি হল জানি না, কিছু

বুঝতেও পারলুম না। দেখলুম সকলে মিলে মায়ের বেশ পরিবর্তন করিয়ে দিলে। মা সেদিন থেকে পরলেন শুভ্র বসন। অল্প বয়েসে তাঁর এই সাজ-পরিবর্তন আমার শিশুমনে কি যে ব্যথার স্পর্শ দিয়েছিল এখনো তা মনের কোণে থেকে গেছে, তারই দরদ মিশিয়ে পরিণত বয়েসে একদিন এ'কেছিলুম মায়ের বৈধব্যমূর্তি।

'এই ঘটনার দু-একদিন পরেই আমরা বাগানবাড়ি ত্যাগ করে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলুম। সেই যে বাগান ত্যাগ করে চলে এসেছিলুম আর সেমুখো কখনো হইনি। সেই সাধের চাঁপদানির বাগানের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। সেখানকার সুন্দর সুন্দর জীবজন্তুগুলো, সেই নিউফাউন্ডল্যান্ড পার্শিয়ান হাউন্ড, সম্বার, হরিণ, তাদের যে কি গতি হল বলতে পারি না। শহরের স্কুল-কলেজের পড়াশুনা আরম্ভ করে স্বপ্নের মতো সেখানকার জীবন ভুলে গেলুম। মা বোধ হয় সেখানে আর কখনো ফিরবেন না বলে সেখানকার প্রাণীগুলোকে বন্ধুবান্ধব মহলে বিলি করে দিয়েছিলেন। সেই বাড়ির সামান্যমাত্র স্মৃতি, এমন কি আসবাবপত্রও মায়ের মনকে গভীরভাবে পীড়া দিত। যাই হোক, সেই সব জিনিসপত্তর আর পোষা প্রাণীগুলোর খোঁজ আমরা আর কখনো করিনি। তখনকার দিনের জীবনের এবং পরবর্তী দিনের মধ্যে একটা যেন পর্দা পড়ে গেল।

'সতেরো বছরে পড়তেই মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। পড়ছিলুম সংস্কৃত কলেজে, বিয়ের পরেই পড়া ছেড়ে দিলুম। ছবি আঁকায় একটু হাত আছে দেখে মেজজ্যাঠাইমা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কুমুদনাথ চৌধুরীকে বলে আমার জন্য আর্ট টিচার ঠিক করে দিলেন। তিনি ছিলেন ইটালিয়ান, নাম মিস্টার গিলহার্ড। এইভাবে আমার জীবনে শিল্পশিক্ষার গোড়াপত্তন হল। বিয়ের পর থেকেই লেখাপড়া কলেজ-জীবন শেষ হয়ে গেল, এল গান-বাজনা, নাচ দেখবার ঝোঁক, তাই নিয়ে থাকতুম মশগুল হয়ে। তারই সঙ্গে চলত চিত্রবিদ্যার চর্চা। এই সময় নানা রকমের ভাবালুতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছি। দেখতুম মা অনেক সময় ছেলের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদে জীবন-স্রোত বিপথে যায়নি।'

'মামা, তোমার গল্প শুনে মনে পড়ছে সেই ছেলেবেলার কথা— সেই যখন বসন্তের সুন্দর সকালে দোলের উৎসব শুরু হয়েছে, সেদিন বড় ছোট সকলে মিলে তোমাদের লালে লাল হবার দিন। আবীরের পুকুর তৈরি হয়েছে, তার উপর পিচকিরি ছোঁড়া হচ্ছে ফোয়ারার মতো। আত্মীয়স্বজন অনেক এসে জুটত, সেদিনকার উৎসবে অবারিত দ্বার। ছোট ছেলেরা নিজেদের মধ্যে খেলত আবীর। তারপর যেত দপ্তরখানায়—সেখানে আধা-বয়সী রামলালদাদা চোখে চশমা এঁটে মাথা হেঁট করে হিসেব

কষতে নিবিষ্ট। তিনি ছিলেন বাড়ির পুরনো দেওয়ান, সেকালের কর্মনিষ্ঠা ও প্রভুভক্তির প্রতীক। ছেলেদের হাত থেকে সেদিন তাঁরও নিস্তার ছিল না। মাথার টাকটি পর্যন্ত সেদিন তাঁর আবীরে লাল হয়ে উঠত আর বাজেখরচের খাতা ভরে উঠত দু আনার লম্বা ফর্দে। ছেলেমেয়েরা আবীরে তাঁকে চুবতো। রামলালদাদা শেষে নিরুপায় হয়ে সাবধানে খাতাপত্র সরিয়ে ফেলতেন, ছেলেদের হাতে খেলনা ও লজেন্স কিনবার জরিমানা দিয়ে তবে সেদিনের মতো বেচারি নিস্তার পেতেন। এই রকম সব উৎসবের দিনে দেখতুম তোমাদের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর বা গোপাল উড়ের যাত্রা প্রায়ই হত। ছেলেদের মেয়াদ ছিল রাত নটা পর্যন্ত, তারপর তাদের শুতে যাবার হুকুম। কিন্তু যাত্রা চলত সমস্ত রাত। এসব জিনিস তখন ছোট ছেলেমেয়েদের দেখা বারণ ছিল। ছেলেরা কেবল যাত্রার দলের বিচিত্র সাজ আর দাড়িগোঁফ জটাজুট এই সব দেখেই সন্তুষ্ট থাকত, সেটা দেখাও ছিল তাদের মস্ত মজা। বাইজীর নাচগান শোনাও তখনকার দিনের শৌখিন লোকেদের বিলাসিতার একটা অঙ্গ ছিল। এই নৃত্যগীত উপভোগ করার জন্য তাঁরা বহু ব্যয়ে দিল্লী থেকে বাইজী আনাতেন। বিশেষত শারদীয়া পুজোয় তারই মহড়া চলত রাতভোর। বিজয়াদশমীর ভাসানের পালা শেষ হলে শুরু হত কোলাকুলি আর প্রণামের পালা, আর তারই সঙ্গে জলযোগ, গোলাপজলের গন্ধযুক্ত সিদ্ধির

শরবত। মনে পড়ে একটা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্য করে আসর সাজানো হয়েছে। নানা রকম ফুলে আলোয় বাড়িটা যেন ঝকঝক করছে। বাইজী যাঁরা এসেছেন তাঁরা সকলেই সংগীতবিশারদ, হিন্দুস্থানী সংগীতে সকলেই সুদক্ষ। তাঁদের সঙ্গে তিনজন করে ভেড়ুয়া থাকত, তাদের কাজ ছিল নাচ ও গানের সঙ্গে সংগত করা। আদবকায়দায় এঁরা সকলেই দুরস্ত, মুসলমানী ভদ্রতা দস্তুরমাফিক রক্ষা করে চলতেন। তাঁদের পেশা বাদ দিয়ে যদি ব্যক্তিকে দেখা যায় তবে বলতেই হবে অনেকেই তাঁদের মধ্যে গুণী ছিলেন। শ্রীজান বাই এবং সরস্বতীর নাম তখন প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু শুনেছি তাঁদের মধ্যে কেউই সুন্দরী ছিলেন না। গলার দরদই তাঁদের সংগীতজ্ঞ-মহলে সুপরিচিত করেছিল। গল্প শোনা যায়, সরস্বতীর গানের মহড়া যখন বসত, পদের প্রথমাংশ গেয়েই তিনি শ্রোতাদের এত মুগ্ধ করে রাখতেন যে রাত দশটায় গানের যে পদ শুরু হত ভোর হয়ে যেত নাকি তার শেষ পদে পেঁছিতে। শ্রীজান শেষ জীবনে শুনেছি সমস্ত সম্পত্তি গরিবদের মধ্যে দান করে মক্কা চলে গিয়েছিলেন।

'এই সব গানবাজনার মজলিস কেবল বড়দেরই জন্য, বউঝিরা জালের পর্দার অন্তরালে বসে অন্দর থেকে গান শোনবার আদেশ শাশুড়ির কাছ থেকে আগেই নিয়ে রাখতেন। গভীর রাতে ছেলেদের কৌতূহলী মন ঘুমের মধ্যে চমকে চমকে উঠত যখন

বৈঠকখানা থেকে নূপুরের আওয়াজের সঙ্গে মিলে ভারি গলার উত্তেজিত বাহবা ধ্বনি নিদ্রার ব্যাঘাত করত। মজলিসের আবহাওয়া দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করে তুলত, ক্রমে বাইজীর গলার পরজের সুর বাগেশ্রী থেকে ভৈরবীতে গিয়ে পৌঁছত, বোধহয় আকাশে তখন উঠত শুকতারা, সুর যদিও তখন প্রাণের ক্লান্তিকে ছাপিয়ে রেখেছে তবু ভাঙতে হত মজলিসের পালা—তখনো আবহাওয়াতে বাজতে থাকত সুরের আমেজ, আর বাসি ফুলের ফিকে গন্ধে মজলিসের ঘর থাকত ভারাক্রান্ত হয়ে।

'কত দোল, কত উৎসবের বিচিত্র দিন এসেছে এই তোমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আজও তার প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি ধূলি-কণার সঙ্গে সেকালের কত কথা কত কাহিনীর স্মৃতিই না জড়ানো। সংগীত সাহিত্য শিল্পে একদিন যে গৃহ ছিল পরিপূর্ণ আজ তার সমস্ত দীপ নিবিয়ে দিয়ে গুণীরা চলে গেছেন। সেই হাস্যমুখরিত সংগীতনন্দিত দালান তোমাদের রসানুভূতির স্মৃতি বুকে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা বললেন, 'সেদিন চলে গেছে, সে আর ফিরবে না। তোরা জানিস না, কি করেই বা জানবি, কি গভীর পিপাসা আমাদের যুবক-চিত্তকে সব সময় উন্মুখ করে রাখত, যে মজলিসের আভাস তোর ছেলেবেলার স্মৃতিতে ছায়া ফেলে গেছে তার জের তখন আসছে ক্ষীণ হয়ে। ওর হাসবার

দিক মনকে নাড়া দিত না, গান শোনবার আনন্দই এই সব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা পেয়েছি। তখনকার দিনে এই উৎসবগুলিই ছিল কলারসোপভোগের পথ।

'যদিও বনেদী ঘরের ভালো মন্দ নানা প্রথার ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছি তবু তখনকার দিনে অন্য ধনী পরিবার থেকে আমাদের বাড়ির আবহাওয়ার বিশেষত্ব ছিল এই যে, জ্ঞানচর্চা, সাহিত্য ও সংগীতের মধ্যে মানুষ হওয়ার দরুণ নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণ করবার রুচি তৈরি হয়েছিল।

'নাটোরের মহারাজার সঙ্গে এই সময় আমাদের ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রায়ই তাঁর বাড়িতে নাচগানের আসরে আমাদের নিমন্ত্রণ হত। এসব আসরে রবিকাকাও কখনো কখনো নিমন্ত্রিত হয়ে যেতেন। তখন সংগীতের পিপাসা মনে এত জেগেছিল যে ভালো গান শুনবার জন্য মন সর্বদাই উৎসুক থাকত। আর হাতে চলত ছবির স্কেচ, স্কেচের পর স্কেচ করে গেছি। এই সময় থেকেই রবিকাকার উৎসাহে স্বপ্নপ্রয়াণ, চিত্রাঙ্গদা এই সব থেকে ছবি এঁকেছি। তখন নতুনকে পাবার জন্য, নতুন কিছু আবিষ্কার করবার জন্য মন সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকত।

'নাটোরের মহারাজার বাড়ি একদিন নাচ দেখবার নিমন্ত্রণ হল। একটি তরুণী সুন্দরীর নৃত্য শুরু হল প্রথমে। তার নাচের কেরামতি ছিল চমৎকার। কিন্তু দেখলুম তার সঙ্গে একটি বয়স্কা

মহিলা। খবর পাওয়া গেল এই মহিলাটি নর্তকীর মা। কন্যার নৃত্যশিক্ষা নাকি মায়ের কাছেই। নাটোরকে বললুম, মেয়ে যখন এত পারদর্শী মা না জানি কি হবে—একবার বলুন না ওকেই নাচতে। নর্তকীর মায়ের বয়েস তখন যৌবনের শেষ সীমায় এসে পেঁাচেছে। তাকে নাচের অনুরোধ করাতে সে বলল, আমি তো নাচের সাজ আনিনি। তবে আমাদের অনুরোধে মেয়ের যা সাজ ছিল তাই পরে সে উঠে দাঁড়াল। কি তার গতি—পা যেন তার পড়ল না মাটিতে, যেন সে চলেছে হাওয়াতে। সে যে বয়স্কা, সে যে সুশ্রী নয়—একথা ভুলে যেতে হল। শুধু তার পায়ের গতি আর দেহের লীলা চোখের সামনে চিত্রলোক তৈরি করে তুলল। সেই বয়স্কা মহিলার নাচ সকলকে মুগ্ধ করেছিল। এই হল সত্যি আর্ট। কালের স্রোতে দেহ তার রূপ হারিয়েছে কিন্তু আর্ট তখনো আছে বেঁচে, তাই দিয়ে সে জ্বালিয়েছিল সেদিনের বাতি। সেই দেখে বুঝেছিলুম যার ভিতর আর্ট থাকে তার শক্তি কতখানি।

'এই সময় শ্যামসুন্দরবাবু এসে একদিন খবর দিলেন কাশী থেকে এক গাইয়ে এসেছে, নাম সরস্বতী বাই। যদি গান শুনতে চান তবে একদিন সন্ধ্যায় আয়োজন করতে পারেন, কিন্তু নেবে তিনশো টাকা। কাশীতে গেলে পঁচিশ টাকা ফেললে গান শোনা যেত। কিন্তু এমন সুযোগ আর নাও হতে পারে। গানের পিপাসা

মনে ছিল প্রবল। শ্যামসুন্দরকে হুকুম দিয়ে ফেললুম, বহুত আচ্ছা, তিনশো টাকাই সই। আমাদের নাচঘরে আসর সাজান হল। আগাগোড়া শাদা ফরাস পাতা, শাদা তাকিয়া ছড়ান। কড়িকাঠের উপর ঝাড়লণ্ঠনের আলো আর দেয়ালে দেয়ালগিরি। নাটোরের রাজা এসেছেন, রবিকাকা এসেছেন আর এসেছেন দীপুদাদা। সরস্বতী বাই যখন ঘরে ঢুকল তখন সকলের চক্ষু স্থির! সভার অনেকেই আস্তে আস্তে তাকিয়া টেনে নিয়ে গালে হাত দিয়ে আড়চোখে চাইতে লাগলেন। নাটোর নেপথ্যে আমাকে ডেকে বললেন, অবনদা করেছ কি, এই লোক কি নাচবে গাইবে, এ যে একেবারে মাংসপিণ্ড। আমরা যা কল্পনা করেছিলুম সব উবে গেল। নৃত্যের আঙ্গিকে সে খুব পটু, তবুও দেহের স্থূলতার দরুন নৃত্যের দিক থেকে বিশেষ সুবিধে হল না। নাটোর বললেন, ওকে বসে গাইতে বল, আমি পাখোয়াজ বাজাব। এইবার সরস্বতী বসে গান ধরল। বলব কি, প্রথম পদ গাইতে সকলের তাক লেগে গেল। নাটোর পাখোয়াজ খুব মিঠে তালে বাজিয়ে গেলেন। আমি বললুম, পছন্দ হল তো? আপনি যে প্রথম দৃষ্টিতেই একেবারে দমে গিয়েছিলেন। নাটোর নীরব। এক গানে সে কাবার করে দিলে দুপুর রাত, সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল।

'রবিকাকাও শুনেছিলেন তার গান, তারিফ করেছিলেন গলা। সকলে আমাকে বললে, একটা গান ফরমাশ করো। ফরমাশ করি কী

করে? গাইয়ে যখন নিজের গানে মশগুল হয়ে যায় তখন কি তাকে ফরমাশ করা চলে? সকলের অনুরোধে একটা ভজন গান শুরু হল—আও তো ব্রজচন্দ্রলাল। সকলে চুপ, আমি ছবি এঁকে চলেছি, কি আঁকছি তা জানি না—সুর আঁকছি কি গায়িকাকে আঁকছি—সুরকে বাদ দিলে তো গায়িকার দিকে তাকানো যায় না; কিন্তু তার কণ্ঠ কুৎসিতকেই এমন অভিনব করে তুলেছিল যে তার বাইরের কুরূপকে ভুলে যেতে হল এই এক গানেই। ঢং ঢং করে রাত দুপুর বাজল, শেষ হল গান।

'এমনি সুরের নেশায় আর একদিন এক বীনকারকে সোনার বালা বকশিস দিয়ে ফেলেছিলুম। সে যে কি বীণা বাজাল, ও রকম আর শুনলুম না। দক্ষিণ দেশের শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে বীনকার ছিল সে।

'গান ভালোবেসেছি চিরকাল, আজও সেই আকর্ষণ সমান আছে, বিশেষ করে রবিকাকার গান আমার মনে বিশেষ করে ছাপ দিয়েছে। কতবার তাঁর গান নিয়ে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছি তর্ক করেছি। তিনি গানের মধ্যে যে সম্পদ রেখে গেছেন তার মূল্য ক'জনেই বা বুঝবে, এক-একটি গানের সুরের মধ্যে কথার মধ্যে সেই মানুষ বেঁচে রয়েছেন। শুধু রিসার্চ করে এ জিনিস কি লোকে বোঝাতে পারবে। এই তোদের মেয়েদের গলা যখন শুনি তখন মনে হয় পাখির কণ্ঠ। সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার পথে কি

একটা ভারি মিষ্টি ফুলের গন্ধ পেলুম, কে যেন বললে পারশিয়ান লাইল্যাক ফুটেছে। সেই গন্ধের সঙ্গে এই গানের সুরের কিছু কি প্রভেদ আছে? ছবির দিক দিয়ে কতটুকুই বা আমি দিতে পেরেছি, কিন্তু রবিকাকা গানের মধ্যে দিয়ে সুরে কথায় যে অম্লান মালা রচনা করে গিয়েছেন তার তুলনা কোথাও তো খুঁজে পাইনে। এই দুঃখই কেবল জাগে যে, গাইতে পারি না। এই সব গান যা শুনে শুনে ফুরোতে পারিনে, তাদের উপভোগের দিনরাত্রি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল আমার।'

মনের ক্লান্তি যাঁর গানের সুরে ডুব দিয়ে স্নিগ্ধ হয়, সেই কণ্ঠ প্রথম যেদিন কানে গিয়েছিল সেদিনের কথা আজও মনে আছে। ছেলেবেলায় মনের উপর দিয়ে কত কিছু ভেসে চলে যায়, যার চিহ্ন পরে খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার অনেক কিছু অন্তরের গভীরে স্থায়ী হয়ে থাকে। তেমনি বোধ হয় গুরুদেবের গলার আশ্চর্য প্রভাব তাঁর নিজের রচিত সুরের মধ্যে দিয়ে সেই সুদূর কালকেও দীপ্ত করে রেখেছে। আজও মনে পড়ে সেদিন ছিল গিন্নীর নাতির বিয়ে, বড় আদরের নাতি; তারই বিবাহ উৎসবের বাসি বিয়েতে সকালে বৌ এসেছিল চতুর্দোলায় করে; সে দোলাটা ছিল একটা দেখবার জিনিস, কিংখাব মুড়ে নানা রকম শিল্পচাতুর্যের আস্তরণ দিয়ে তাতে ঢাকা দেওয়া হয়েছিল, কাষ্ঠদণ্ডের দুই প্রান্তভাগ দুটি রুপোর হাঙরের মাথা দিয়ে সাজানো—বৌ বসে ছিল ভিতরে, অজস্র মূল্যবান গয়নার ঝলক পাতলা আস্তরণের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল, বাইরে থেকে তারই একটা রহস্যাচ্ছন্ন ছবি চারিদিকে লোকের ভিড় জড়ো করে

তুলেছিল। সকালে বৌ আসার গোলমাল চুকে গেল, বাসি বিয়ের সানাই বেজে বেজে ঝিমিয়ে পড়েছে অপরাহ্নের শেষভাগে। কর্মক্লান্ত মন সকলেরই ক্লান্তিতে ভরা, অবসাদের ছায়ায় বাড়ি নিঝুম, সন্ধ্যার সময় দেখা গেল এবাড়ি ওবাড়ির বাবুরা বৈঠকখানায় জড়ো হচ্ছেন। পেশাদার নর্তকীরা সেদিন বিদায় নিয়েছে —সন্ধ্যার সময় সেদিন ছিল অভিনব আয়োজন। ছোট ছেলেদের কৌতূহলী দৃষ্টি জিজ্ঞাসা করছিল, 'আজ আবার কি হবে?' বড়দের মুখে শোনা গেল, 'আজ রবিকাকার গান হবে।' বাড়ির মেয়েরা ও প্রতিবেশিনীরা একদিকে জালের পর্দার আড়ালে এসে উঁকি মারছে সকৌতুকে। সকলেই গান শোনবার জন্য উৎসুক। আসর যখন ক্রমে ক্রমে ভরে উঠেছে দেখা গেল একজন দীর্ঘকায় বিশিষ্ট চেহারার ব্যক্তি কালো ফিতেয় ঝোলানো চশমা পরে সভায় এসে বসলেন। তাঁর বিশিষ্টতা সভার আবহাওয়ার মধ্যে যেন একটা সম্ভ্রম জাগিয়ে তুলল। সকলের অনুরোধে তিনি যে গান শুরু করলেন সেটি যতদূর মনে পড়ে 'যামিনী না যেতে জাগালে না কেন'। গানের সুরের ধারা শ্রোতাদের অন্তর গভীরভাবে স্পর্শ করল। স্তব্ধতায় তাদের চিত্ত হল নম্র। শিশুরা অবাক হয়ে রইল থমকে, এ তো যে-সে গলা নয়, যা তারা ক'দিন ধরে শুনে আসছে। এ যেন কোন্ নতুন স্বর তারা প্রথম শুনল এই পৃথিবীতে, যেন তাদের কাছে মর্তলোকের নতুন পরিচয়

উৎসবের শেষ সন্ধ্যায় সার্থক হল। এমনি করেই সেদিনের বিবাহের উদ্দাম উৎসব-স্রোতে কেমন এক অনির্বচনীয়ের স্পর্শ লেগেছে অকস্মাৎ। সেদিন তো চলে গেছে কিন্তু সেই সন্ধ্যার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো নিবে যায়নি।

তখনকার দিনে বাড়ির ছেলেমেয়েরা কবিকে দূর থেকেই দেখতে পেত। তিনি যে একজন গুণী, আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনে শুনে সেটা তারা অনুভব করেছিল, কদাচিৎ কবির দর্শন পেলে সসম্ভ্রমে দূরে থাকাই তখনকার প্রথা ছিল। তাঁর মতো গুরুজনের কাছে আসবার সাহস বা উৎসাহ তারা বড়দের কাছ থেকে পেত না।

এই বিবাহ-উৎসবই শেষ জমকালো ঘটনা ওবাড়িতে হয়েছিল। তার পরের বছর দিদিমার নয়নমণি আদরের নাতি গেহেন্দ্রকে কাল ছিনিয়ে নিয়ে গেল। সেই শোকের আঘাতে আমার মাতুল-পরিবারের সমস্ত জীবনযাত্রা গেল উলটেপালটে। শিল্পীদের মনের দরজায় বাস্তব জগৎ এই প্রথম একটা কড়া রকমের ধাক্কা মেরে গেল।

স্বদেশী যুগের কিছু আগে মিস্টার ওকাকুরা তাঁর তিন বন্ধু আর্টিস্ট টাইকোয়ান, কাৎসুতা ও হিষিদাকে নিয়ে ভারতে বেড়াতে আসেন। এই খবর পেয়ে গগনেন্দ্র এবং অবনীন্দ্র তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন। এই তিনটি জাপানী চিত্রকরই তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। এই সূত্রে তাঁদের কাজ চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ দুই

ভাইয়ের সেই প্রথম হয়। তারপর থেকে অনেক স্বদেশী বিদেশী অতিথি তাঁদের শিল্পসংগ্রহ দেখবার জন্য যাতায়াত করতেন। কেউ বা অতিথিরূপে বাড়িতে থেকেও যেতেন। তাঁদের মধ্যে রদেনস্টাইন, কাউণ্ট কাইজারলিং, আনন্দ কুমারস্বামী, সুইডেনের প্রিন্স উইলিয়ম-এর কথা মনে পড়ে। এইভাবে যে গৃহ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল ক্রমে তার দরজা খুলেছিল বাইরের দিকে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানাবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় দুটি লম্বা চেয়ার নিয়ে দুই ভাই বসতেন। সেদিন বাঙলার দুই বড় শিল্পীর আসন পাতা হত যেখানে, সে স্থান আজ শূন্য। বাঙলা শিল্পের ইতিহাস একদিন গড়ে উঠেছিল সেই দক্ষিণের বারান্দাটিকেই কেন্দ্র করে। গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রের মিলিত সাধনা শিল্পের একটি নবযুগ সূচনা করেছিল। তারই সঙ্গে এসে মিলেছিল জাপানী শিল্পীর আঙ্গিক। মনে পড়ে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে গেছেন জাপানী আর্টিস্টের দল। আর-একদিকে গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র চালাচ্ছেন তাঁদের তুলি। ভারতমাতার ছবিখানি সেই সময়েই অবনীন্দ্রনাথ কোনো স্বদেশী সমিতির অনুরোধে আঁকেন। নানা রকম পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এই ছবিখানার উপর। ওয়াশের পর ওয়াশ দিয়ে কি করে যে বড় ছবিটা শেষ করেন তা আজও মনে পড়ে।

এদিকে টাইকোয়ান-এর তুলিতে চলেছে তখন রাসলীলার সৃষ্টি।

বারান্দায় জমাট আবহাওয়াতে এই তিনটি শিল্পীতে মিলে চলেছে রঙ ও রেখার মাতামাতি খেলা। বোধহয় বা সে সময় ছিল পূর্ণিমার রাত, টাইকোয়ান আঁকছিলেন রাসলীলা—ছবি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু আর্টিস্ট ভেবে পাচ্ছেন না কী করে ছবিতে তুলির শেষ স্পর্শ রাখবেন। তাই তাঁর ছবিখানা শেষ হয়েও হতে চাচ্ছে না। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে ছবিতে সবই ফুটেছে—প্রেমের উন্মাদনা কৃষ্ণ ও গোপিনীদের তরল চাঁদনী আলোয় গলিয়ে দিয়েছে, চিত্রের মূর্তিগুলি রঙ ও রেখার সমন্বয়ে মিলে মিশে গেছে কোন্ অরূপ সাগরের গভীরে—তবুও শিল্পীর প্রাণ তৃপ্ত হয়নি, মন কেবলই বলছে আমার রূপ-সৃষ্টির সাধনা তো এখনো শেষ হল না। সুর তো এখনো ঠিক মনের সঙ্গে মিলছে না। এই চিন্তা তাঁকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে রাত্রে ঘুমতে না পেরে ভোরের দিকেই গৃহসংলগ্ন বাগানে খোলা হাওয়াতে বেরিয়ে পড়লেন। বাগানের মধ্যে এ ফুল সে ফুল নানারকম লতাপাতার মধ্যে তাঁর অতৃপ্ত মন শান্ত হল। চা খাবার জন্য ঘরে ফিরে দেখলেন একটি সাজিতে সদ্যফোটা জুঁই-ফুল কে সাজিয়ে রেখে গেছে, তারই কয়েকটি ঝরে-পড়া পাপড়ি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তাঁর চোখ উঠল জ্বলে, কোন্ অদৃশ্য প্রেরণায় তিনি বুঝে নিলেন তাঁর রাসের উৎসব শেষ করতে হবে ঝরা ফুলের পুষ্পবৃষ্টিতে। তুলির টানে ছড়িয়ে গেল পাপড়ির দল,

চাঁদের আলোয় উৎসবের রাত আনল মনের উপর স্বপ্নের আবেশ, শেষ হল তাঁর ছবি। আজ সে বিখ্যাত ছবি আর নেই, জাপানী ভূমিকম্পের প্রলয়-নৃত্যের মধ্যে সে লুকিয়েছে। কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ স্রষ্টার কাছে জীবন্ত থাকবে চিরকাল—সে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বহুকাল পরে মিস্টার সেন্ডা যখন শান্তিনিকেতনে এসে কবির অতিথি হয়েছিলেন, সেই সময় এক-দিন এই গল্পটি তিনি গুরুদেবকে শোনান। তিনি বলেন, টাইকোয়ানের মনে এই ছবিখানি শেষ করবার কাহিনী এখনো এত উজ্জ্বল হয়ে আছে যে তিনি বন্ধুমহলে এই গল্পটি প্রায়ই করে থাকেন।

দিদিমা একদিন তাঁর বিদেশী অতিথিদের স্বদেশী দস্তুরে খাওয়ানোর আয়োজন করলেন। ছেলেদের ডেকে বললেন, 'তোদের জাপানী বন্ধুরা দেশী রান্না ভালোবাসে, আমি একদিন বাঙলা দস্তুরে ওদের খাওয়াব।' খাবারের জায়গা সেদিন সাজানো হয়েছিল বিশেষভাবে দিশী তৈজসপত্র দিয়ে। নানা বিচিত্র গড়নের কাঁসার পাত্রের উপর ফুল রাখা হয়েছিল। গোলাপ ও আতরের গন্ধ ঢালা পানীয় এবং বাদামপেস্তার বিচিত্র নকশার মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হল।

বিদেশী শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল সেই সব পাত্রের দিকে—যেটি দেখেন সেটিকে হাতে করে তুলে নিয়ে বলেন,

'মিস্টার টেগোর, এটি যে মাস্টারপিস্‌। এই রকমের একটা বাটি আমাদের নারার মিউজিয়ামে রাখা আছে। জাপানের প্রাচীনকালের কোনো রানীর শখের আসবাবের মধ্যে সেটি পাওয়া গিয়েছিল। তোমাদের এই বাটির আকৃতির সঙ্গে তার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য তা বলতে পারি না।' এই বিদেশী আর্টিস্টদের ছিল আশ্চর্য দৃষ্টি-শক্তি। ওরা দেখতে জানত, তাই চারদিক ওদের কাছে ছিল জীবন্ত। আঁকবার বিষয় নিয়ে ওদের মাথা ঘামাতে হত না। যা দেখত তুলির টানে বের করে আনত তার বিশিষ্ট রূপ। নিজের মনের মধ্যে সকল প্রাণের রূপকে অনুভব করা, দরদ দিয়ে জগতটাকে দেখা—বিষয়ের সঙ্গে এমন করে একাত্ম না হলে কি আঁকা যায়?

এই সব আর্টিস্টদের পাশে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলের তৈরি বাড়ির পুরনো বাঁধা আর্টিস্ট হ.চ.হ. তখন ম্লান হয়ে গেছেন। যেমন মামাদের স্টুডিয়োর লালপেড়ে-কাপড়পরা বঙ্গ-লক্ষ্মীর তৈলচিত্র জাপানী চিত্রের আভিজাত্যের পাশে দাঁড়াতে পারল না, তেমনি বেচারী হরিশচন্দ্র হালদার ওরফে হ.চ.হ. থেলো হুঁকো হাতে মুর্শিদাবাদ বালাপোশের তলায় লুকিয়ে পড়লেন। সিন পেণ্টিঙের জন্য তাঁর আর ডাক পড়ল না।

সেকালের সঙ্গে এই মানুষটি এমন করে জড়িয়ে আছেন যে

তখনকার দিনের কথা বলতে গেলে এই লোকটিকে আপনি মনে পড়ে। শোনা যায় যখন কবি এবং সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি স্কুলে পড়তেন সেই সময় হ.চ.হ. ছিলেন তাঁদের সহপাঠী। সোদ্দাই এই বহুগুণযুক্ত মানুষটিকে সংগ্রহ করে পরিবারের তরুণমহলে পরিচিত করিয়ে দেন। তখনকার দিনে আর্টিস্ট এবং সাহিত্যিক হিসাবে হ.চ.হ.-র খ্যাতি ছেলে-মহলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর হ.চ.হ. নামকরণ সোদ্দাই করেছিলেন। এ হেন সাহিত্যিকের লেখা নাটকে কবি পর্যন্ত একদিন তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে নায়িকার পার্ট অভিনয় করেছিলেন। 'গল্পসল্প' গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। হ.চ.হ.-কে নিয়ে তাঁদের কৌতুকের ইয়ত্তা ছিল না। লোকটির গুণ ছিল অনেক। যেমন এক জাতের মানুষ আছে যারা গাইতেও পারে, আঁকতেও পারে, লিখতেও পারে, কিন্তু সব গুণ থাকা সত্ত্বেও কোথাও একটা স্ক্রু আলগা থাকায় তাদের প্রকৃতির সবটাই বাঁধনহীন ঢিলেঢালাভাবে প্রকাশ পায়, হরিশবাবুও ছিলেন তেমনি।

তখনকার দিনের বাড়ির ছেলেদের ভালোবাসার অসংখ্য আবদার-অত্যাচার এই লোকটিকে সহ্য করতে হত। এই মানুষটিকে নিয়ে যেমন, অকারণ হাসিতামাশা সৃষ্টির এমন উপায় বোধ করি এত সহজে আর পাওয়া যেত না। তাঁর দাড়ির উপর ঠাট্টা করে কোনো ছেলে কবিতা লিখেছিল, 'রাবড়ি আবরি গোঁফে'। কবি তাঁর

'গল্পসল্পে' এই মানুষটিকে লক্ষ্য করেই লিখেছেন—'নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে ফল দেখা গেল এই হাসিতে, আর বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি।'

সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার বছরে প্রথম পরিচয় হরিশের সঙ্গে আমার মামাদের। দিদিমা তাঁকে রুগ্ন ছেলেদের সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন, ক্রমে সেই লক্ষ্মীছাড়া লোকটির উপর তাঁর মমতা পড়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সুখদুঃখের খোঁজখবর নিতেন। ভালো রান্না হলে, পুজোপার্বণে সামনে বসিয়ে তাঁকে খাওয়াতেন।

এই সময়ে বড়মামা গগনেন্দ্র সপরিবারে পীরপাহাড়ে বেড়াতে যাবার আয়োজন করেন; কিন্তু হ.চ.হ. না গেলে এমন ভ্রমণটি মাটি হয়ে যায়, তাই মায়ের অনুমতি নিয়ে হরিশ পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে সঙ্গের সাথী হলেন।

পীরপাহাড়ে এই খ্যাপাকে নিয়ে তাঁদের দিনগুলো ছিল হাসিতে ভরপুর। পাহাড়ে কয়েকদিন বাস করার পর বাবুদের হুঁশ হল, কিছুদিন ধরে হরিশকে দেখা যাচ্ছে না। সেখানে একটা তাও-খানার মতো ছোট ঘর ছিল তারই গর্তের ভিতর তিনি অদৃশ্য হয়েছেন—ব্যাপার কি? বড়বাবুর জোর তলব পড়াতে একদিন গুটিসুটি মেরে হরিশ এসে হাজির। বড়বাবু বললেন, 'কী খবর হে, তুমি যে একেবারে কোটর থেকে বেরতে চাও না—কী হয়েছে তোমার?'

মাথা চুলকতে চুলকতে হরিশ বললেন, 'মশায়, বেরব কি, ক'দিন ধরে পীরপাহাড়ে একটা বাঘ এসেছে।'

বাবুরা তো সকলে হো হো করে হেসেই অস্থির। বড়বাবু বললেন, 'তোমাকে কেউ ভয় দেখিয়েছে হে, আজ রাতে ডেকে নিয়ে দেখিয়ো তো কেমন বাঘ।'

'সেখানে আপনারা কেমন করে যাবেন! সে কি সম্ভব!'

অবশেষে বাবুরা নাছোড়বান্দা দেখে হরিশ রাজি হলেন বাঘ দেখাতে। সেদিন রাত বারোটার সময় তিনি উঠে এলেন, কিন্তু তখন ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছেন। হরিশের অবস্থা দেখে বাবুদের করুণা হল, বললেন, 'চলো, ছাদের উপর থেকেই তোমার বাঘ দেখা যাক।' সকলে ছাদে উঠে পীরপাহাড়ের আস্তানা লক্ষ্য করে দেখলেন কিছু যেন একটা শুয়ে আছে। হরিশ বললেন, 'ঐ দেখুন মশায়, বাঘ চপ্ চপ্ করে ঘাস খাচ্ছে।' ছোটমামা অবনীন্দ্র বললেন, 'আচ্ছা, এস ওটাকে ঢিল ছোঁড়া যাক।' ঢিলের ঠেলায় সে উঠে পড়ল, তখন দেখা গেল সে বাঘ নয়, শাদা গরু—সবাই তো হেসে অস্থির। হ.চ.হ.-রও ভয় গেল কেটে। এই মানুষটিকে দেখলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে মনে পড়ত। জানি না আফিমের মৌতাত হ.চ.হ.-র ছিল কিনা। কিন্তু তাঁর চেহারা ও হাবেভাবে এমন একটা কৌতুকজনক ভঙ্গি দেখতুম যে ছোটবেলায় আমরা পর্যন্ত হেসে অস্থির হতুম।

গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র দুটি ভাই ছিলেন যেন মানিকজোড়। এঁদের মনোবীণার তার ছিল একই মিড়েতে বাঁধা। তাঁদের চিন্তা ও কল্পনা ছিল তেমনি সম-সাধনায় ব্রতী। আকৃতি-প্রকৃতিতে দুই ভাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন হলেও বস্তুত সেই পার্থক্য বিরোধের সৃষ্টি না করে বরং তাঁদের চরিত্রে ও কর্মে বিশিষ্টতা এনে দিয়েছিল। তাঁদের শিল্পদৃষ্টি প্রথম থেকেই কলারসের দুটি স্বতন্ত্র ধারাকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হলেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব বা আন্তরিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গগনেন্দ্রনাথের অল্প বয়সের শখ ছিল পেস্টবোর্ড কেটে নানা রকম ছবি এঁকে স্টেজ তৈরি করা এবং তাতে ছোট ছোট চিত্র দিয়ে নানা রকম নাটকের অভিনয় করানো। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সন্ধের সময় এই চিত্রনাট্যগুলির মজা উপভোগ করত। মনে আছে, আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার ছবি দিয়ে তিনি একসময় আমাদের অভিনয় দেখিয়েছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ নিজেও একজন বড় দরের অভিনেতা ছিলেন। জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ছেলেরা যখন অভিনয় করতেন, এঁদের তিন ভাইয়েরই সে আসরে ডাক পড়ত। মেজো ভাই সমরেন্দ্রনাথ ছিলেন লাজুক মানুষ, তিনি সংকুচিত হতেন নিজেকে প্রকাশ করতে, পড়াশুনোতেই তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল —বিদ্যা-অর্চনাতেই সমস্ত জীবন কাটিয়েছেন। গগনেন্দ্রনাথ ভাইদের মধ্যে সুশ্রী, খুব মজলিশি, ও বহু সামাজিক গুণসম্পন্ন

মানুষ ছিলেন। তাঁর চেহারা ও সদালাপ সুধীসমাজে তাঁকে সুপরিচিত করেছিল। আমাদের কোনো বিদেশী মহিলাবন্ধু তাঁকে 'রাজা' খেতাব দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, গগনেন্দ্রনাথ জন্মগত রাজা, 'বর্ন্ কিং'। কবির অনেক নাট্যাভিনয়ে তিনি রাজার পার্ট নিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথ শিশুকাল থেকেই ছিলেন কৌতুকপ্রিয়। তাঁর ধরন-ধারণ চলা-বলা সমস্তই একটি বিশেষ স্বকীয়তাকে প্রকাশ করত। তাঁর গলার আওয়াজে একটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁর সমতুল্য গলার আওয়াজ পূজনীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো শুনিনি। নীতুমামা যখন লাইব্রেরি ঘরে এসে ছেলেদের হাঁক দিয়ে ডাকতেন তখন আমরা যে যেখানে থাকতুম ভয়ে দৌড়ে হাজির হতুম তাঁর কাছে। আমাদের উপর বরাত ছিল যে যটা পান এনে দিতে পারবে তাকে তিনি ততটা সিগারেটের ছবি দেবেন। তখন বাড়িতে দৈনিক প্রায় পাঁচশো কুড়ুই-পান মেয়েরা সাজত। সেই পানের উপর দিদিমার নানা রকম কড়া আইনকানুন ছিল। দিদিমার বাক্স থেকে সেই পান সংগ্রহ করতে অনেক কৌশলের দরকার হত। সিগারেটের ছবির লোভে দিদিমার অলক্ষিতে পানের বাক্স থেকে ছেলেদের হাতে হাতে তাঁর কত যত্নে রাখা প্রিয় জিনিস অদৃশ্য হয়ে যেত। এই পান সংগ্রহের জন্য দিদিমার দাসীদের মন খুশি করতে অনেক তোষামোদ করতে

হত।* তারই পরিবর্তে আমরা সংগ্রহ করতুম নানা রকম মেম-সাহেবের ছবি আর সিগারেটের বাক্স থেকে রুপোলি রাঙতা। নীতুমামাও খুশি হয়ে পানগুলিকে পকেটে পুরে হাসতে হাসতে চলে যেতেন। তাঁর এক ধমকে যে এত কাজ হতে পারে সেটাই তাঁর বোধহয় মজা লাগত। এই গলার আওয়াজ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ এবং নীতীন্দ্রনাথে দুই বাড়ির বারান্দা থেকে চলত পাল্লা।

কৌতুক-নাট্যের পার্টে অবনীন্দ্রনাথের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। শোনা যায় কবিগুরু 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনকড়ির চরিত্রটি বিশেষ করে তাঁর কথা মনে রেখে লিখেছিলেন। এই পার্টে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অতুলনীয়। তাঁর বই 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে তিনি উল্লেখ করেছেন ছোটবেলা তাঁকে 'বোম্বেটে' বলে ডাকা হত। সেই বোম্বেটে ছেলের জন্য কবি তিনকড়ির বোম্বেটে চরিত্রের কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই নাটকের পুনরভিনয়ের সময়ে যখন অন্য কেউ তিনকড়ির পার্ট অভিনয় করতেন, তখন দর্শকদের মধ্যে অবনীন্দ্রের অভিনয়দর্শী যাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁরা বলতেন, অবনীন্দ্রের মতো করে কেউই তিনকড়ির চরিত্র জীবন্ত করে তুলতে পারবে না। কবিগুরুও তাঁকে ব্যঙ্গনাট্য অভিনয়ে একজন মাস্টার-আর্টিস্ট বলেই মনে করতেন। ফাল্গুনীতে এবং ডাকঘরের মোড়লের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আজও তাঁদের স্মৃতিপটে সে ছবি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

জাপানী আর্টিস্টদের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী-খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু প্রবাসী-সম্পাদক প্রভৃতি মুষ্টিমেয় অনুরাগীদের কথা বাদ দিলে, বাঙলাদেশ তখনো তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিজের চিত্রকর বলে গ্রহণ করেনি। একদিকে বিদেশী কাগজে তাঁর ওমর খৈয়ম ইত্যাদি ছবির প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়ে শিল্পরসিক মহলে সাড়া জাগিয়েছে, অন্যদিকে বাঙলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকা তাঁর ছবির ত্রুটি আবিষ্কারে ব্যস্ত। তা তাঁকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করতে পারেনি, সকল সমালোচনা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে পিছপা হননি। তাঁর ভিতরে ছিল প্রতিভার আগুন, সে আগুন চাপা দেবার সাধ্য ছিল না কারো। বাইরের কথায় কান না দিয়ে তিনি নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন। মোগল, পারশিয়ান, অজন্তা—সব মিলিয়ে যে নবীন আর্ট সৃষ্টি করলেন সে হল স্বকীয়তাপূর্ণ তাঁর নিজের দান।

মামাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'জীবনের পরিবর্তন তোমার এল কিসের মধ্যে দিয়ে, কেমন করে তুমি খুঁজে পেলে তোমার শিল্প-মন্দিরের পথ?'

মামা বললেন, 'যখন শিল্পচর্চা শুরু করেছিলুম তখন কিছু ভেবেচিন্তে করিনি। নিজেকে প্রকাশ করতে হবে, কিছু গড়ে

তুলতে হবে, বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আবেগ তখন খুব প্রবল ছিল। রবিকাকা আমাদের তখনকার তরুণজীবনে পথে চলবার উৎসাহ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দিনের বিশ্ব-ভারতীর আদর্শ সেই বহুকাল আগেই তাঁর অন্তরে কাজ শুরু করেছিল—কেবল তখনো সে ছিল চারা গাছ। আমাদের বাড়ি ছিল বাঙলা দেশের সংস্কৃতির কেন্দ্র। তারই মধ্যে থেকে মানুষের যে গভীরতম প্রকৃতি, তা বিকাশ করবার সুযোগ আমাদের শিশুকাল থেকে হয়েছিল। বলতে গেলে গৃহের মধ্যেই সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেছিলুম. স্কুলকলেজের শিক্ষার চাপ ছিল না।

'হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় ভারি অদ্ভুত উপায়ে হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতার আর্ট স্কুলে তিনি নতুন এসেছেন। কার মুখে খবর পেয়েছিলেন একটি লোক দেশী -স্টাইলে ছবি আঁকছে। মেজো জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনি সেই আর্টিস্টের খবর নেবার জন্য জ্যাঠাইমার কাছে এসেছিলেন। জ্যাঠাইমাই প্রথম সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেন। এদিকে ঠিক সেই সময় আমি মোগল, পারশিয়ান কাঙড়া আর্ট দিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করেছি, তাদের অপূর্ব নৈপুণ্য, অসামান্য কারুকার্য আমার মনকে মুগ্ধ করেছিল। সেই পদ্ধতি আয়ত্ত করবার জন্য তখন উঠে পড়ে কৃষ্ণচরিত আঁকতে আরম্ভ করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাতে মনের তৃপ্তি হয়নি।

এককালে চিত্র আঁকাকে শিল্পীরা বলত : পুত্‌লী বানায়া সত্যিই সেগুলো মানুষের পুতুল-মূর্তি ছিল। এইগুলিতে কারিকুরির অভিনব খেলা, কারুকার্যের চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যেত, কিন্তু প্রাণ কই! পুত্‌লীর কারুকার্য নিয়ে ভারতীয় চিত্রকলা চিরদিন তো পরিতৃপ্ত থাকতে পারে না। শুধু রূপ নিয়ে আর কতদিন চলবে? প্রাণ কই? মন বললে, আমি কী করতে পারি, আমার কী দেবার আছে? ভিতর থেকে সাড়া পেলুম, সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'লাইনই হল আকৃতির বন্ধন—এই রেখার বেষ্টনে প্রকৃতি বিচিত্র নকশা তৈরি করেছে, কিন্তু যেখানে অ্যাবস্‌ট্রাক্ট আইডিয়া বা ভাবরাজ্যের কথা এসে পড়ে সেখানে লাইন আর এগোতে পারে না। তখন রঙের অসীমতার মধ্যে তাকে ডুব দিতেই হয়। এই দেখ না, পারশিয়ান আর্ট চীনে আর্টের কাছ ঘেঁষে চলে গেছে, কিন্তু চীনে আর্টের বিশিষ্টতা দেখি রেখার সীমাকে এড়িয়ে রঙের নিবিড়তা ও মনের প্রসারের মধ্যে ডুব মেরেছে। ছবিতে রেখা যখন প্রধান হয়ে দেখা দেয়, তখন তার তাৎপর্য সীমার দ্বারা পরিমিত। কিন্তু যখন তার নির্দেশ অজানা অচেনা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে তখন রঙিন রূপ তার আঁকতেই হয়। আমার বিশ্বাস অজন্তার ছবি প্রাচীনকালে রঙপ্রধান ছিল। এখন সময়ের গতিতে রঙ খসে পড়েছে, কোথাও বা ফিকে হয়ে গেছে, তাই লাইনগুলো

প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। ভাবপ্রধান ছবি আঁকতে হলে রঙের আঙ্গিক আয়ত্ত না করে উপায় নেই।

'খুব শোকের অবস্থায় মন যখন মুহ্যমান হয়ে রয়েছে, হ্যাভেল সাহেবের কাছ থেকে হুকুম এল, একখানা ছবি চাই। দিল্লীর দরবারে একখানা ছবি পাঠাতে হবে। আমি বললুম, সাহেব, আমি এখন পারব না, শোকে আমি কাতর, এখন কি আমার হাত দিয়ে ছবি বেরবে? সাহেব বললেন না, না, এই কাজই তোমার ওষুধ. এই কাজের মধ্যেই তুমি সান্ত্বনা পাবে।

'সাহেবের কথায় বসলুম তুলি-রঙ নিয়ে, অয়েলকলার দিয়েই ছবি শুরু করা গেল। অয়েলকলারের টেকনিক তখন ভালো করেই আয়ত্ত করেছিলুম, সেই প্রণালীতেই আঁকলুম শাজাহানের ছবি।' মামা একটু থেমে মৃদু হেসে বললেন, 'সিক্‌রেট আছে রে, সিক্‌রেট আছে। যে টেকনিকই ব্যবহার করি না কেন, তাকে চালাবার মন্ত্র জানা চাই, যাতে করে সেই জিনিস আমারই জিনিস হয়ে উঠবে। এই ছবিখানাই অনেক দিন পরে ওয়াটারকলারে আবার কপি করে দিয়েছিলুম। আমার মতে দ্বিতীয়খানা আরো ভালো হয়েছিল, কেননা ওয়াটারকলারের হদিস তখন খুব বুঝে গেছি। রঙ ব্যবহারের কতকগুলো নিয়ম আছে—যেমন নীল রঙকে প্রধান করতে হলে তার পাশে শাদা না দিলে সে ফুটবে না। আলো-ছায়ার রহস্যের প্রতি মনোযোগ

দিলে রঙের মিলনের সামঞ্জস্য যে কোথায় তা সহজেই বোঝা যাবে। প্রতি আর্টিস্টেরই উচিত যেখানে আলো-ছায়ার যোগাযোগে আকৃতির মডেলিংকে প্রকাশ করে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। আকৃতির ভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য রঙেতে আলো ও ছায়ার প্রয়োজন। রঙের নিজস্ব নিবিড়তা ও বিশিষ্টতা রক্ষা করতে না পারলে ছবিতে ভাব ফোটানো কঠিন হয়। শাজাহানের ছবিতে কারুকার্য কিছু কম করিনি—মোগল টেকনিক দিয়ে সেই প্রথম ভাবব্যঞ্জনার ছবি আঁকলুম, এঁকে-টেকে মনে হল, একটা শাদা কাঁথা গায়ে না দিলে যে সুর ছবিতে বাঁধতে চাই তা বাজবে না। তাই দিলুম সেই ময়লা শালের একটুখানি পোঁছ শাজাহানের গায়ে। যন্ত্র যেমন নানা যন্ত্রীর হাতে নানা রকমে বাজে—কেউ বা সেতারে ওস্তাদ, কেউ বা সুরবাহারে, কেউ বা সারেঙ্গীতে আর কেউ বা বীণায়। তেমনি আমার হাতে রঙের যন্ত্র বেজেছে আমারই মনের সুরে তালে।'

বোধহয় তেরশো এগারো সাল থেকে প্রায়ই স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে হতে দেখেছি। অনেক স্বদেশী ও বিদেশী শিল্পরসিক ও পণ্ডিত লোকেরা পুরাতন শিল্প-নিদর্শনগুলি দেখতে আসতেন। এই প্রদর্শনী সুন্দর করে সাজানো হত, সেদিন অনেক সাধারণ ব্যবহারের তৈজসপত্রও সেখানে স্থান পেত। প্রতিদিনের ব্যবহারে যেসব জিনিসের সৌন্দর্য আমাদের চোখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সাজানোর কায়দাতে সেদিন আবার নতুন করে তাদের গড়ন মনকে মুগ্ধ করত। বাড়ির যতগুলি মরচেধরা বাসনপত্র ছিল সেদিন মানুষের দৃষ্টিতে তারা যেন কায়াপরিবর্তন করত। এমন করে লক্ষ্য তাদের আগে তো কেউ করেনি, বহুদিনের অনাদরের সিন্দুকের মধ্যে তারা আভিজাত্যের গৌরব নিয়ে বন্ধ ছিল। গুণীদের চোখে তাদের মূল্য সেদিন ধরা পড়ত। এই সুধীজনসমাগমে প্রীতিভোজনেরও বন্দোবস্ত থাকত। বেশির ভাগ সময়ই রাতের দিকে একজিবিশন খোলা হত। নবীন বাবুর্চির হাতে টেবিল সাজানোর ভার পড়ত।

তার হাতের রান্না ছিল চমৎকার। হরেক রকমের বিদেশী মিষ্টান্ন বিলিতী দস্তুরে সে টেবিলের উপরে সাজিয়ে দিত। নবীন ছিল তখনকার দিনের ঠাকুরবাড়ি মহলে প্রসিদ্ধ সূপকার—প্রাচীন গান্ধার থেকে তার আমদানি হয়নি, সে ছিল খাঁটি বর্মাদেশী বাবুর্চি। ইংরেজি রান্নায় ওস্তাদ, তার রান্না তখনকার দিনের আহারবিলাসীদের রসনাকে কল্পনাতেও রসিয়ে তুলত। দিদিমার দৌলতে নাতিনাতনীদের কপালে এ হেন লোকের হাতের তৈরি পুডিং আইসক্রিমের ছিটেফোঁটা কখনো কখনো এসে পেঁছিত।

আর্টের আবহাওয়া বাড়িতে যখন খুব জমাট সেই রকম কোনো সময়ে আমরা একবার কাশী বেড়াতে যাই। অবনীন্দ্রনাথ আমার মা বিনয়িনী দেবীকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন সেখানি নিচে দিলুম। তার থেকে তখনকার দিনের শিল্পীর মনের ভাব কল্পনা অনেকটা বোঝা যাবে।

বৃহস্পতিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

কাশী থেকে তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। সারনাথ অতি আশ্চর্য জায়গা আমি সেবারে এলাহাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এসেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল আমার

মনে হ'ল যে মন্দিরের কোণে কুয়োটার ধারে আমার দোকান ঘর ছিল সেখানে বসে আমি মাটির পুতুল আর পট বিক্রি করছি সহরের ছেলে-মেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে রং চং করা পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে গল্প-গুজব করছে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে নামছে। এসব যেন অনেক দিনের স্বপ্নের মত মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য যে অতগুলো ঘরবাড়ির মধ্যে আমার ঘরটি আমি দেখেই চিনতে পারলুম ৫ কি ৬ হাত চৌকো একটি ছোট ঘর দরজার উপরে দুটি হাঁস পাথরের চৌকাটে লেখা আছে। তোমরা বোধহয় সে ঘরখানি দেখনি সেটা নেহাৎ ছোট সামান্য দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে পড়ে আছে। সারনাথের যাদুঘরে যেসব মাটির ঘোড়া খুরি গেলাস কুঁজো দেখেছো সে সব আমার হাতে গড়া তার কোনো ভুল নেই। তখনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে।

লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হয় সারনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনি হয়েছিল।

তোমাদের শুঃ

অবনদাদা

এই চিঠির মধ্যে শিল্পীর পূর্বানুভূতির আভাস পাওয়া যায়। মানুষের অচেতন মনের তলায় কত সত্যই যে জড়িয়ে থাকে, কত

স্মৃতি থাকে লুকনো, আমাদের মননশক্তির পরিধি কম, তাই হয়তো স্মৃতির ধারাবাহিকতায় বিচ্ছিন্নতা আসে, ভুলে যেতে হয় অতীতের ঘটনা, কিন্তু চেতনার অজানা ভাণ্ডারে অনেক কিছু সঞ্চিত হয়ে থাকে, হঠাৎ তার প্রকাশ দেখলে চমকে উঠতে হয়। শিল্পীর ইন্দ্রিয়বোধ সাধারণের চেয়ে এত বেশি তীক্ষ্ম যে তার সৃষ্টির মধ্যে জন্মজন্মান্তরকেও সে জীবন্ত করে তুলতে পারে। তাই অবনীন্দ্রের মন যেন তাঁর অতীতকালকে বার বার ফিরে পেয়েছে তাঁর ছবির মধ্যে। সেই মন যখন নিজের কেন্দ্র খুঁজে পাবার জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মীয়বিচ্ছেদব্যথার মধ্যে তাঁর কাছে ধরা পড়ল জীবনের সেই গভীর তাৎপর্য, সাজাহান যে স্বপ্ন দিয়ে গড়েছিলেন তাজ, সেই রসানুভূতি নিংড়ে ফুটে উঠল তাঁর সাজাহানের মৃত্যুশয্যার চিত্র। সে কীর্তির কথা তিনি ইতিহাসেই পড়েছিলেন, নিজের চোখে কখনো দেখেননি, কিন্তু কি এক অপূর্ব অনুভূতির অদৃশ্য শক্তি বাস্তবকে ছাড়িয়ে তাঁকে নিয়ে গেল অনেক দূরে। ভাবজগতের নিছক রত্ন দিয়ে খচিত চিত্রখানি তখন আর কেবল কাগজের উপর আঁককাটা ছবি রইল না, তার ইঙ্গিত বহন করল বহুদূরের বাণীকে। এমনি করেই ওমর খৈয়মের ও আরব্যোপন্যাসের ছবির উৎপত্তি, এগুলি যেন তাঁর চিত্র-জগতের লিরিক্। এই লিরিকাল উপাদানই হল অবনীন্দ্র-শিল্পের বিশেষত্ব। রঙের ও রেখার সমন্বয়ে যে সংগীতক আকর্ষণ আছে

তারই রসে ছবি হল তাঁর প্রাণবন্ত। তাঁর 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু' চিত্রের মধ্যে বাজছে কালাংড়া সুর, 'মরণোন্মুখ উটে'র দেহ-ভঙ্গীতে গোধূলির বিদায়গাথায় পূরবীর অবসন্নতা উঠেছে ফুটে। তাঁর চিত্রগুলির রঙ-রেখার বিন্যাসে জড়ানো আছে সুরের অসীমতা, তাই চোখে দেখার অন্তরালে, মনোলোক ঘিরে কাঁপতে থাকে একটি অনির্বচনীয় সেতারের ঝঙ্কার।

আমার মাকে লেখা অবনীন্দ্রের আর-একখানা চিঠিও এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

-

শনিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আগ্রার শুভ্র স্বপ্ন আর হিমাচলের তুষার তরঙ্গ দুইই দেখিবার সামগ্রী; এক মানুষের সৃষ্টি অন্যটি ভগবানের খেলা—অতি অনির্বচনীয়! ঘরে বসিয়া মনে করিতাম—বরফের পাহাড় বুঝি একখানা প্রকাণ্ড মেঘের মত সাদা হইবে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি কতই না তফাৎ—সে তীক্ষ্ণতা ও ধবলতা মেঘে সম্ভবে না। তোমার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি আগ্রার তুমি সকলি দেখিয়াছ কিন্তু ফতেপুর ও সেকেন্দ্রার কোন কথা লেখ নাই যে? আগ্রায় শাজাহান বাদশার সকলি পাইবে কিন্তু আকবর শাহের যা কিছু ওই দুই জায়গায় দেখিবে।

শেষেন্দ্র যে কোন কথাই বলে না। তার কি সেখানে ভাল লাগিতেছে না? বেচারা বড়ই একা পড়িয়াছে দেখিতেছি। তোমার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় খুব আনন্দে আছে। কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য বা মর্যাদা একটু অধিক বয়সে না দেখিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। যমুনার পরপারে শাজাহানের নিজের জন্য কালো পাথরে এক সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিতে দিলেন তাঁহার ইচ্ছা যমুনার উপর দিয়া এক সেতু নির্মাণ করাইয়া দুই সমাধিমন্দির একত্র যোগ করিয়া দিবেন—সে জায়গাটা দেখিয়াছ কি? মীনাবাজারের যেখানে রাজপুত মহিষী আকবরশাহের বুকে ছুরি বসাইতে গিয়াছিল সে স্থান দেখিবার উপযুক্ত। নুরজাহানের পিতার সমাধি যাহাকে বলে ইত্মাতউদ্দৌলা, কেল্লার ভিতরে বেগমসাহেবার গোর এই সকল ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে ভুলিওনা। আমি যদি সঙ্গে থাকিতাম তবে এসকল স্থান নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির করিতাম। মথুরা বৃন্দাবন আর মথুরা বৃন্দাবন নাই কিন্তু আগ্রা এখনও সেই আগ্রাই আছে৷ শেষেন্দ্রকে বলিও যদি পুরাতন ছবি সংগ্রহ করিতে পারে তবে যেন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী যখন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন, কলকাতায় তাঁদের আর্ট-গ্যালারি দেখাবার বন্দোবস্ত হল।

গবর্নমেণ্ট হাউস থেকে সেক্রেটারি একদিন মামাকে টেলিফোন করলেন, 'রাজা ও রানী যখন আর্ট-গ্যালারি দেখতে আসবেন তোমাকে সেদিন উপস্থিত থেকে রানীর 'স্যাপেরন' হতে হবে আর ওরিয়েণ্টাল আর্ট সম্বন্ধে বুঝিয়ে দেবার ভার তোমারই উপর।' মামা বললেন, 'জানিস তো. এই শুনেই মেজাজটা গেল খারাপ হয়ে, অভিধান ঘেঁটে স্যাপেরন কথাটার অর্থ বার করতে হল, অনিদ্রা ও ভাবনায় সমস্ত রাত কাটল। তার পরদিন ধড়া-চুড়ো পরে আর্ট-গ্যালারি হলে গিয়ে হাজির হলুম।

'চারদিকে রাজা রানী আসবার আয়োজনে, সাহেবসুবোর গোলমাল আর বাঙালী সাহেবদেরও উত্তেজিত হাবভাবে হল্ সরগরম হয়ে উঠেছে। আমি তখন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এদিকে রাজা রানী এসে পড়লেন। পারিষদ-দল সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করল—আমি যতটা পারি লোকারণ্যের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও লর্ড হার্ডিঞ্জের চোখ এড়াতে পারলুম না। তিনি আমার দিকে রানীকে এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, ইনিই মিস্টার টেগোর, বর্তমান যুগের ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট। লর্ড হার্ডিঞ্জ পরিচয় করিয়ে দেবার পর হাতখানা আমি অতি সংকোচের সঙ্গে বার করে দিলুম। রাজা রানী দুজনেই সম্ভাষণ করলেন হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, হাউ ডু ইউ ডু, হাউ ডু ইউ ডু বলে। আমার

প্রাণ তখন ধুকধুক করতে লেগেছে। বেচারা 'ইণ্ডিয়ান আর্টিস্ট' এইসব কায়দাকানুনে একেবারেই অনভ্যস্ত। আমি আমার কোণটার ভিতর লুকোতে পারলেই বাঁচতুম সে সময়ে। আমার দুঃখ কুইন মেরী বোধহয় বুঝতে পারলেন, তাই তিনি কথা চালিয়ে আমার সংকোচ ঘুচিয়ে দিলেন। আমি ছবির পর ছবি তাঁকে অনুসরণ করে গেলুম মাত্র। আমার তিষ্যরক্ষিতা ছবিতে ঈর্ষান্বিত গর্বিত ভাব তখন আমি নতুন এঁকেছি। রানীর সে ছবিখানি ভারি পছন্দ। তারই কাছে দাঁড়িয়ে ছবি সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা আমাকে করতে হল। তারপর রাজা রানী সময়মতো চলে গেলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাড়ি ফিরে তবে নিশ্চিন্ত। সন্ধে-বেলায় ব্লাণ্ট সাহেব এসে হেসে বললেন, হাউ আর ইউ অবন-বাবু? আমি বললুম, আর রসিকতায় দরকার নেই। আই অ্যাম ডান্ ফর, আমাকে একেবারে সেরে ফেলেছে। তার পরদিন গবর্নমেণ্ট হাউস থেকে খবর এল তিষ্যরক্ষিতার ঐ ছবিখানি রানীর জন্য চাই। আর কে রাখে, চলে গেল তিষ্যরক্ষিতার ছবি বিলেতে।'

সে সময়ে ক্ল্যাসিকাল গান ও নর্তকীর যুগ চলে গেছে। এমন কি বিদ্যাসুন্দরের পালা আর গোপাল ভট্টের যাত্রার দলকেও আর দেখা যেত না। শিবুর কীর্তন আর ক্ষেত্রচূড়ামণি কথকঠাকুরের কথকতার মধ্যে ছেলেবুড়ো তখন মশগুল হয়ে থাকত। দীনেশ সেন মহাশয় এবং অন্যান্য রসপিপাসু সাহিত্যিকরা সন্ধের সময় উপস্থিত হয়ে কখনো বৈষ্ণব পদাবলী কখনো বা ক্ষেত্রচূড়ামণির কথিত মহাভারতের আখ্যান উপভোগ করতেন। শিবুর কীর্তনের মধ্য দিয়েই আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর রস উপভোগ করেছি। শিবুর কীর্তনগানের কায়দা ছিল নতুন রকম। শিলাইদাতে ছিল তার বাড়ি, পুণ্যাহের সময় গুরুদেব তার কীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে আসেন আমার মামাদের গান শোনাবার জন্য। শিবু কিছুদিন তার দলবল নিয়ে জোড়াসাঁকোর দপ্তরখানায় বেশ জমিয়ে বসেছিল। সেই সময় ঠাকুরবাড়িতে প্রায়ই খিচুড়িভোগ হত। বৈষ্ণবের দল সেই মাধুকরী খেয়ে পরম ফূর্তিতে দিন কাটাত। আর তাদের কাজই ছিল

সন্ধের সময় কীর্তন গান করা। এইভাবে তাদের ছ'মাস' গান চলেছিল। পরিবারের সকলের কাছে এই সন্ধ্যাটি বড় উপভোগের হত। শিবুর ছিল গৌরবর্ণ নধর দেহ। পৈতের গুচ্ছ থাকত তার গলায়, কোমরে বাঁধা থাকত একখানা সিল্কের চাদর। তার মুখখানায় একটু মজার ভাব ছিল। কীর্তনের মাঝে মাঝে যখন সে ললিতা, বিশাখা বা ননদিনী-সংবাদে এসে পড়ত তখন তার সকৌতুক চোখমুখের ভাব নাটকীয় ভঙ্গিতে পদাবলীর আখরে আখরে নতুন রঙ লাগাতে লাগাতে চলত, সঙ্গে সঙ্গে সুরও জমে উঠত দ্বিধাদ্বন্দ্বের বৈচিত্র্য নিয়ে। শিবুর কণ্ঠ অতি সহজেই সুরের মধ্যে চরিত্রের সংঘাতগুলি জমিয়ে তুলতে পারত। সে জানত কী ভাবে কীর্তন প্রাণ দিয়ে গাইতে হয়। এই গাইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না বলে কীর্তন অনেক সময় একঘেয়ে হয়ে পড়ে। সে শ্রোতাদের কখনো হাসিয়ে কখনো কাঁদিয়ে গানের পালা শেষ করত। কখনো বা তার দেহভঙ্গি খোলের উত্তাল তালের সঙ্গে দোল খেতে খেতে জমিয়ে তুলত : 'রঙ্গিণী সঙ্গিনী সঙ্গে চলিল রাধে।' কিম্বা 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।' এই সব বৈষ্ণব পদাবলী শিবুর হাতের ভঙ্গিতে চোখের অভিনয়ে রসিয়ে তুলত রসপিপাসুদের প্রাণ। সেই সঙ্গে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত তিন-চার ঘণ্টার মতো।

এমন সময় এসে পড়ল বঙ্গভঙ্গের ব্যাপার। তারই উত্তেজনায়

সারা বাঙলা দেশ তখন মাতোয়ারা। তার মধ্যে ছোটবড়র তফাত ছিল না। সকলেই উঠেছে তখন মেতে, গুরুদেবের স্বদেশী গান তখন কণ্ঠে কণ্ঠে। বাঙলাদেশের সে একটা অদ্ভুত দিন গেছে, সমস্ত দেশকে একটা আইডিয়ার মধ্যে এমন ভাবে জেগে উঠতে কেউ কখনো দেখেনি। স্বদেশী বলতে তখন এই কথাটাই মনে হত সমস্ত দেশের মধ্যে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে হবে।

সকল দিক থেকেই কালের স্রোত গতি বদল করেছিল। এমন কি আহারে-বিহারেও ছেলেমেয়েদের তরুণ মন বেশ একটু নাড়া খেয়েছিল। বেশভূষার মধ্যে বিদেশী ধরনধারণ তাদের চোখকে পীড়িত করত। তখনকার মিড-ভিক্টোরিয়ান প্যাটার্নের নেকলেস ইয়ারিং ব্রেসলেটের উপর তারাও কটাক্ষপাত করতে শিখেছিল। বাড়ির মেয়েদের গয়না-কাপড়ের নকশায় সেকেলে জয়পুরী মিনের কাজ আর পুরনো ঢাকাই বালুচরের চেলির ফ্যাশান ফিরে এল। সেই সঙ্গে গুজরাটের ছোট ছোট আয়না-বসানো কারুকার্যের আদরও শুরু হল। পুরনো গয়না, সিঁথি-কঙ্কণ, কানবালা ও সাতলহরী পুরমহিলাদের আবার মনোহারী হল। এই সময় কেউ কেউ সনাতন গয়নাকাপড়ের নকশা ত্যাগ করে নিজেদের উদ্ভাবিত গয়নাকাপড়ের দিকে নজর দিলেন। এ সকল বিষয়ে বড়মামা গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ উৎসাহী। তাঁরই মাথা থেকে নানা

রকম নতুন ব্যবহারের জিনিস বেরত। তিনি অনায়াসেই অতি সাধারণ জিনিসের একটি নতুন চেহারা গড়ে তুলতে পারতেন। এদিকে বিদেশী ছাঁদে আঁকা তৈলচিত্রগুলি কখন বৈঠকখানা হতে ক্রমে ক্রমে সরে পড়ল, সেই জায়গায় সাজানো হল পারশিয়ান আর মোগল-কাঙড়া ছবি। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের বিদেশী ছাঁদের আসবাবপত্র তখন গুদামজাত। স্বদেশী নকশার টেবিল চেয়ার দেখা দিল, মাদুরের গদি-আঁটা তক্তপোশের উপর পুরনো কায়দায় দিশী ছাঁদের তাকিয়া সাজান হল। পিলসুজের উপর উঠল পাথরের গেলাসের ঢাকা। এইভাবে নানা প্রকার বিচিত্র ব্যবহারিক জিনিস দিয়ে নতুন ড্রইংরুম হল সাজানো। এই সময় গগনেন্দ্রনাথ নতুন স্টাইলে ছবি আঁকা শুরু করেছেন। তাঁর ছবিতে শাদা কালোর সমন্বয় জাপান ও চীনের পুরাতন শিল্পকে মনে করিয়ে দিলেও তাঁর চিত্র ছিল নিজস্ব গৌরবে বিশিষ্ট। গগনেন্দ্রের মন ছিল অনুসন্ধানী, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার নানা প্রকারের নতুন উন্মেষ তাঁরই তুলিতে প্রথম দেখা যায়। শাদা কালোর সামঞ্জস্য দিয়ে জাপানী ও চীনে ধরনের ছবি তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন, ক্রমে সে চেষ্টা ব্যক্তিত্বের রসে পূর্ণ হয়ে নিজের স্বকীয়তায় পরিণত হয়েছিল। ভারতের স্বাধীন সংস্কৃতির যুগ যদি কখনো ফিরে আসে তবে কালের অন্ধকার গুহা থেকে লুপ্ত শিল্পের উদ্ধার করতে গিয়ে দেশবাসী হয়তো অবাক হয়ে চেয়ে

থাকবে এই গুণীর অবলুপ্তপ্রায় রত্নগুলির দিকে। এই আর্টিস্টের মন ছিল অনুসন্ধানশীল, তিনি এক থেকে আর এক নতুনের সন্ধানে ঘুরেছেন, রোমাণ্টিক চোখে দেখেছেন বিশ্বকে, তাঁর ছবি মানুষের মনের রহস্যে ভরা। অজানিতভাবে মানুষ যেমন মনের ঝাপসা ছায়া নিয়ে খেলা করে, স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তার খেলাঘর, মানুষের সেই অজ্ঞাত প্রকৃতির রহস্যে পূর্ণ হল তাঁর ছবি। প্রাকৃতিক দৃশ্য, ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে দিয়ে মানুষের এই বিচিত্র রস-পূর্ণ জীবনকে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা তিনি করে গেছেন। এমন একটি জগতের খবর শিল্পী তাঁর ছবিতে রেখে গেছেন যার অনুসন্ধান তাঁর নিজেরও শেষ হয়নি। 'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর'—তিনি কেবলই খুঁজে বেড়িয়েছেন. জানতেও পারেননি কখন সেই পরশমণির ছোঁয়া লেগে মন তাঁর আলো হয়ে গিয়েছিল।

নতুন চেষ্টার মধ্যে ছিল একটা তরুণ প্রাণের পরিচয়। মানুষ তখন কেবল পলিটিক্স করেই সন্তুষ্ট হয়নি। চেয়েছিল নিজের দেশকে ও জাতিকে নানা দিক দিয়ে অনুভব করতে। এদিকে শিবুর মধুর পদাবলী বৈঠকখানায় আর নতুন রসের সৃষ্টি করে না। স্বদেশী যুগের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই 'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম' আর মৃদঙ্গের বোল, শ্রোতাদের আবেগের ধ্বনি এল নীরব হয়ে। ক্ষেত্রচূড়ামণি কথক তখনো কুরুক্ষেত্রের বর্ণনা ও

গীতার ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের চিত্তকে রুদ্ররসে উত্তেজিত করে রেখেছিলেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের সঙ্গে তখনো বেখাপ্পা হয়নি। ‘সন্ধ্যা’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকা তখনকার দিনে ছেলেমেয়েদের হাতে হাতে ঘুরত, সমস্ত দিন তারা উৎসুক হয়ে থাকত কাগজখানি পড়বার জন্য। দিদিমাও দেখতুম এ রসে বঞ্চিত ছিলেন না, নাতিনাতনীদের সঙ্গে তিনিও স্বদেশী পত্রিকার কড়া প্রবন্ধগুলি উপভোগ করতেন। হঠাৎ যেন পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমাদের শিশুকাল একটা নতুন অধ্যায়ে এসে পড়ল।

সেদিনের সেই স্বদেশী আন্দোলন একটা অদ্ভুত দিন, তার মধ্যে কত রকমের নূতনত্ব ছিল—কখনো শুনছি বয়কট হচ্ছে, কখনো উপবাস, রাখীবন্ধন, পিকেটিং এই সব নিত্য নূতন উত্তেজনায় দেশের কল্পনা যেন মেতে উঠেছিল। তাকে বলা যেতে পারে রাষ্ট্রজগতের একটা রোমাণ্টিক যুগ, যার উত্তেজনায় পশুপতিবাবুর উঠোনে স্বদেশী বক্তৃতায় একদিনে লক্ষ টাকা উঠে গেল। সভার শেষে বাক্স ভরে টাকা নিয়ে নেতারা যখন গাড়ি চড়লেন সাধারণ লোকে ‘মায়ের ভাণ্ডার চলেছে’ বলে কলরব করতে লাগল। ছেলেবুড়ো সকলে মিলে সেদিন একটা রাষ্ট্রীয় মুক্তির কল্পনাকে অনুভব করেছিলেন। শুনেছি সেদিন ধনী থেকে আরম্ভ করে দীনতম সকলেরই দানে থলি পূর্ণ হয়েছিল। মুক্তির প্রেরণায় একদল লোক অনায়াসে প্রাণ পর্যন্ত দিয়ে দিল।

এই আন্দোলন বাস্তবের দিক থেকে ব্যর্থ হলেও ভাবের দিক থেকে হয়নি। নৈতিক দিক থেকে এর একটা নতুন বিকাশ দেখা গেল যার ফলে দেশবাসী সংগঠনপ্রণালীর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল। কতকগুলি নিঃস্বার্থ তরুণ জীবনের আত্মদান আমাদের এই গতানুগতিক স্রোতের বাঁধ ভেঙে দিল। সেদিন বাঙলার মরা গাঙে যে বান ডেকে উঠেছিল আজকের দিনের আন্দোলনের মধ্যে সেই আপন-ভোলার প্রেরণা কই?

যুগান্তরের সম্পাদকীয়, কবিতার দু-এক ছত্র এখনো মনে আছে। তখনকার দিনে এই কবিতাগুলি অল্প বয়েসের ছেলেমেয়েদের মনে বীররসের উত্তেজনা জাগিয়ে তুলত। তারই কয়েক ছত্রঃ

রক্ত আমার উঠেছে নাচিয়া
রুদ্ধ ধমনী বহিয়া,
হৃদয় আমার স্পন্দিছে আজ
মরণচুম্ব যাচিয়া।

তারপর আর একদিন বেরল :

না হইতে মা গো বোধন তোমার
ভেঙেছে রাক্ষস মঙ্গলঘট
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার
পূজিব তোমার চরণতট।

সে সময়ে যুগান্তর পত্রিকার 'সম্পাদক' বদল প্রায়ই হত,

জেলে যাবার জন্যও তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হত। 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধবের লেখাও খুব জোরালো ছিল। রাখীবন্ধনের একটি অনুষ্ঠান এই সময়ে গুরুদেব আরম্ভ করিয়ে দেন। সেদিন নাটোরের মহারাজা থেকে আরম্ভ করে অনেক অভিজাতবংশের লোকই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা দল বেঁধে গুরুদেবকে অনুসরণ করে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, দিনেন্দ্রনাথ; আমার স্বামীর তখন বয়স খুব অল্প, তিনিই বোধহয় সে দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গুরুদেবের রচিত স্বদেশী সংগীত গঙ্গার ঘাটকে মুখরিত করে তুলেছিল। চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে কখনো হাঁটেননি যাঁরা সেদিন তাঁরা দাঁড়ালেন আপামর সাধারণের সঙ্গে একত্র হয়ে। গুরুদেবের স্বদেশী গান গাইতে গাইতে শোভাযাত্রা বেরল। পথে মুটেমজুর যাকে পেলেন সকলেরই হাতে বেঁধেছিলেন রাখী। সেদিন সেই রাখীবন্ধনের মন্ত্র ছিল 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই'। গুরুর সেই মন্ত্র কি দেশবাসীর অন্তরে আবার একদিন নতুন জাগরণ এনে দেবে না? সাময়িকভাবে হলেও সাম্য-বাদের আভাস ঘরে ঘরে সেই যুগে যে গভীর আবেগ ছড়িয়ে দিয়েছিল সে আবেগ যতই অচিরস্থায়ী হোক না কেন, দেশকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়ে গেল।

এই সময়েই আর্ট এবং সাহিত্যেরও নতুন ধারায় প্রবণতা দেখা দিল। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার, স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়দের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা ঘটে এই স্বদেশী যুগের সময় থেকে। অবনীন্দ্রনাথকে ঘিরে শিল্পের যে সৌরজগৎ গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যদের দ্বারাই সেই শিল্পসংস্কৃতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর একটি গভীর আত্মীয়সম্পর্ক ছিল - যে সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর মন পারিবারিক গণ্ডির বাইরে মুক্তি পেয়েছিল। এই গুরুশিষ্যের আন্তরিকতা তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় প্রচুর রসদ যুগিয়েছে। তাঁরই উৎসাহে মিসেস হেরিংহামের সঙ্গে একদল ছাত্র অজন্তা-গুহার ছবি কপি করতে যান। নন্দলাল বসু এবং অসিত হালদার ছিলেন এই তীর্থযাত্রার দলপতি। অজন্তা থেকে এঁদের ফিরে আসবার কিছু পরেই অবনীন্দ্রনাথের স্টুডিওর দেয়াল ভরে উঠল সেই ভাঙা গুহার ছবিতে। এবার খাঁটি ভারতীয় চিত্র—আর জাপানী ছবি নয়। অজন্তার মনোরম ছবিতে ঘরখানা ভরে গেল, জাপানী ছবিগুলি তখন সে ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল, কেবল টাইকোয়ানের রাসলীলা তখনো স্থান পেয়েছিল অজন্তার ছবির এক পাশে।

এই স্টুডিওর মধ্যে দিয়ে শিল্পীর চারটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পর্ব স্মরণে রইল। প্রথম দেখা গিয়েছিল দেয়ালের

উপর লালপেড়ে-শাড়িপরা কলসী-কাঁখে বাঙলাদেশের গ্রামের মেয়ের তৈলচিত্র। সে সময় বিষয়বস্তু স্বদেশী হলেও আঙ্গিক ছিল বিদেশী। তারপর এল কাঙড়া আর মোগল চিত্রাবলী, আর কিছু পরে এল জাপানের চিত্রশিল্পের প্রভাব, তারপর দেখলুম অজন্তার বিশ্ববিশ্রুত চিত্র। এই সময় শিল্পীদের মনের সমস্ত আদর্শ বদলে গিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন স্বদেশী আঙ্গিকের উপরই দেশের নতুন আর্টকে গড়ে তুলতে হবে, বিদেশের কাছে ধার-করা জিনিসে চলবে না।

মামা বললেন, 'হ্যাঁ, এই স্বদেশী আন্দোলনের কাছাকাছি সময় থেকেই আমি আর্টস্কুলে মাস্টারি শুরু করেছিলুম। সুরেন গাঙ্গুলী, নন্দলাল আর অসিত তখন আমার প্রধান ছাত্র। আমার ক্লাশে ছিল একটু বিশেষত্ব। আমি কখনো ছাত্রদের নিয়ে স্কুল-মাস্টারি করিনি। আমিও আঁকতুম তারাও আঁকত একসঙ্গে বসে। ওকাকুরাও সেই সময় এদেশে এসেছিলেন। তিনি আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্ট দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরই উৎসাহে টাইকোয়ান ও হিষিদাও ভারত ভ্রমণে এলেন আমাদের ভারতীয় শিল্পকে ভালো করে জানবার জন্য। হিষিদার ছিল মেয়েলি চেহারা, হাস্যালাপে পটু, ভারি রসিক লোক। আমরা তাঁকে নিয়ে নানা রকমে মজলিস জমাতুম। টাইকোয়ানের কাছে হিষিদা তখনো শিষ্যশ্রেণীতে ছিল। টাইকোয়ানকেও একদিন আমায় রীতিমতো

ইণ্ডিয়ান আর্টের লাইন শেখাতে হয়েছিল। আমরা উভয়েই উভয়কে আর্টের টেকনিক দেখাতুম। ওদের সব লাইন টানার কায়দা দেখে নিয়েছিলুম, সিল্ক-পেণ্টিং ঈশ্বরীপ্রসাদ নিল শিখে। আমার বসে বসে ক্লাস করা পোষাত না। ওরা রীতিমতো স্টাডি করত। আমি যখন আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল, কাৎসুতাকে গভর্নমেণ্ট থেকে স্কুলে আনানো হল ছাত্রদের জাপানী পেণ্টিং শিক্ষা দিতে। সেই সময় নন্দলালদের ওর হাতে ফেলে দিয়েছিলুম লাইনের কাজ স্টাডি করবার জন্য। কি যে আনন্দে ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করে যেতুম, সে রকম মজার দিন আমার জীবনে আর আসেনি। আমি আর নন্দলালরা মিলে ছবির পর ছবি এঁকে গেছি। রোজ নতুন নতুন ছবি বের হয়েছে, তার আর বিরাম ছিল না। ছাত্র আর গুরুতে মিলে সৃষ্টি করা—এই রকমই ছিল আমার ক্লাশ। সে যে কি স্ফূর্তি তা বোঝাতে পারব না। তখন নতুন আর্ট গ্যালারির জন্য বড় বাড়ি উঠেছে। একদিন উপরওয়ালাদের কাছ থেকে হুকুম এল ক্লাসরুমের উন্নতি করতে হবে—দেখলুম আমাদের ছবি আঁকার ঘরের দেয়াল ভেঙে ফেলে দিল, চারিদিকে মিস্ত্রীদের অনবরত গোলমাল চলত, তাতেও আমাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সেই ধুলোবালির মধ্যে বসেই আমরা কাজ করে চলেছিলুম। নন্দলালরা বললেন, ভালোই হয়েছে মশাই, দেয়ালটা ভেঙে ফেলে। আমরা বাইরের দিকটা এখন ভালো করে দেখতে পাব।

'কাজ তখন নিজেও পুরোদমে করেছি, নন্দলালদের দিয়েও করিয়ে নিয়েছি। তখন ছাত্রদের মধ্যে নতুন সৃষ্টির একটা আগ্রহ অনবরত তাদের মনকে ঠেলা দিচ্ছিল। ওরা হিন্দু পুরাণকথার দিকে চলে গেল, আমি মোগলেই টি'কে রইলুম। ওরা নিল্ অজন্তার দিক, আমি রইলুম পারশিয়ানে। এরই কিছুদিন পরে এল আমার মাস্টারির শেষ দিন।

'তখন নানা পারিবারিক কারণে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে পাহাড় ভ্রমণে যাব বলে ছুটি চেয়েছিলুম। ইতিমধ্যে তখনকার উপর-ওয়ালার বিলেত যাবার দরকার হল, কাজেই তিনি আমাকে ছুটি দিতে নারাজ। এদিকে আমার মুসৌরী পাহাড়ে যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আমারও না গেলে নয়। আর এদিকে কর্তা আমাকে বলছেন : ছুটি দেব না, তোমাকেই চার্জ নিতে হবে স্কুলের। আমি বললুম : আমাকে পাহাড়ে যেতেই হবে, আগে থেকেই সে ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আমি এখন চার্জ নিতে পারব না। হাই অফিসার মেজাজ দেখিয়ে বলে উঠলেন, তুমি গভর্নমেন্টের অর্ডারের বিরুদ্ধে যেতে চাও? ইউ আর বুলিয়িং। কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেল। আমি রাগের জ্বালায় আমার লাঠিটা সেই মেজের উপর জোরে ঠুকে গাড়ি করে বাড়ি চলে এলুম। বলে এলুম, সাহেব, রইল তোমার চাকরি, আজ থেকে কাজে ইস্তফা দিলুম। তারপর কাজের পালা শেষ করে দিয়ে মুসৌরী চলে

গেলুম। এ ঘটনার কিছুদিন পরে লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তুমি ঠিকই করেছিলে, আমি হলেও এই কাজই করতুম। আমি তাঁকে বলেছিলুম, সাহেব, দুই সূর্য এক আকাশে থাকতে পারে না। তোমরা যাকে বেছে এনেছ সেই থাক্, আমার দ্বারা এ চাকরি চলবে না। তোমরা যদি আমাকে কিছু দিতে চাও তবে ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটিতে দিও, সেইখানেই আমার সত্যিকারের কর্মক্ষেত্র হবে। এমনি করেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর গোড়াপত্তন হল। ক্রমে সেইটাই সেদিনকার জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের দুই ভাইয়ের মিলনের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।'

অতীতের ছায়াপথে হারিয়ে গেছে ছেলেবেলার রঙিন দিন, তবুও কিছু সুখ দুঃখ, মোহ স্বপ্নে ভরে আছে সেই ছেড়ে-আসা বেলা। তথ্য হিসাবে তার মূল্য না থাকলেও ব্যক্তিগত মনে সে যে নিখুঁত জলছবির ছাপ রেখে গেছে তাতে ভুল নেই। কেই বা জানে সেদিনের আশা-প্রত্যাশা কত-না নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে জীবনের ধাপে ধাপে। মানুষ আপন কল্পনায় ছিল আনমনা। হঠাৎ পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পড়ল তার ডাক। জীবনযাত্রার প্রথম অধ্যায় শেষ হল এক অভাবনীয় ঘটনায়। সেদিন যখন 'সাগরিকা' স্টিমার একটি শোকাচ্ছন্ন পরিবারকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিল,

গোধূলির ধূসর কুয়াশায়, তখন সবেমাত্র অস্তরবির রাঙা আভা মরণোন্মুখ দিনের মুখের উপর অবসানের আচ্ছাদন দিয়েছিল টেনে, ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের ছায়া পড়েছিল গঙ্গার বুক জুড়ে, নিশুতির অতল কালো গভীর মন যেন তলিয়ে যাচ্ছিল ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত পদক্ষেপের অস্পষ্ট আতঙ্কে: সেদিনের ঝড়ের আঘাতে ডানাভাঙা পাখিকে যিনি স্নেহে বুকে টেনে নিলেন, সেই গগনেন্দ্রের করুণ কণ্ঠ আজও যেন মনের মধ্যে শুনতে পাই। অভিভূত প্রাণে তাঁর হাত ধরে 'সাগরিকা' ছেড়ে নেমে পড়লুম, পিছনে পড়ে রইল দুঃস্বপ্নের মতো ক্ষণিকের সঞ্চয়, পানসি ভেসে চলল বাবুঘাটের দিকে, 'সাগরিকা'ও দূর হতে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল দিগন্তের যবনিকার অন্তরালে।

এইখানে আমার সেকালের কথা শেষ হল। অবনীন্দ্রনাথের আর্ট স্কুল ত্যাগের কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমিও তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লুম।